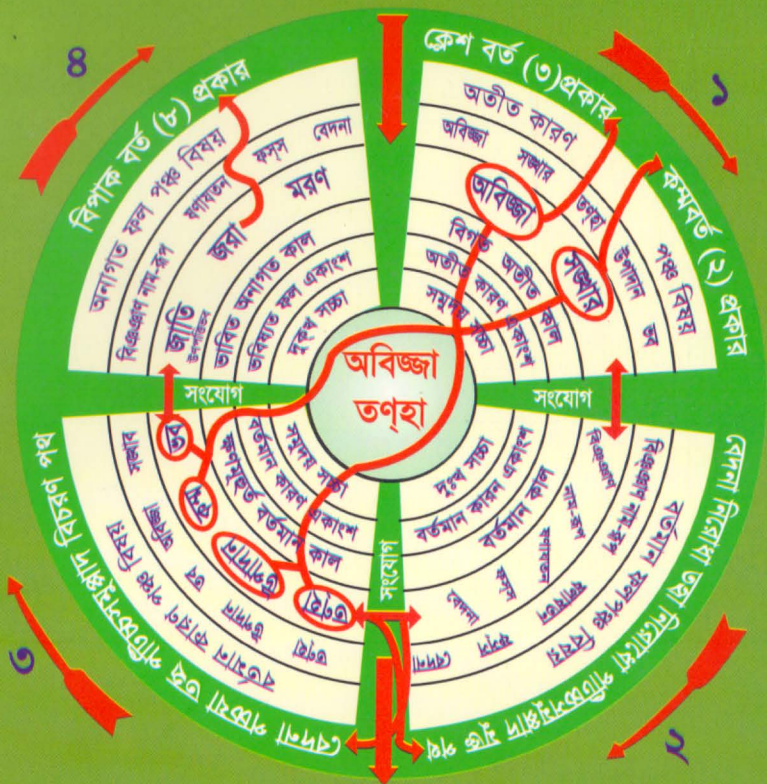


## মোগোক্ ছেয়াদ'র দেশনা



অনুবাদক :

দিলীপ বড়ুয়া দীপু



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

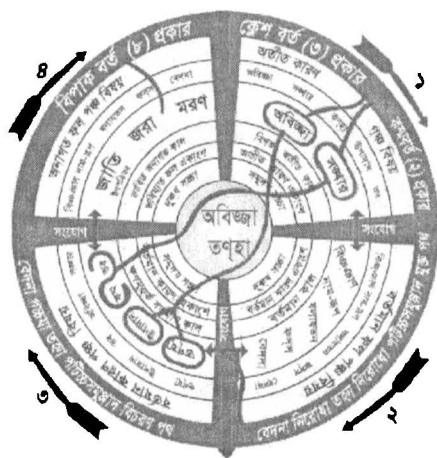
কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব  
The Doctrine Of Patticcasamuppada  
মোগোক্ ছেয়াদ'র দেশনা



অনুবাদক :  
দিলীপ বড়ুয়া দীপু

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব  
The Doctrine Of Patticcasamuppada

মোগোক্ ছেয়াদ'র দেশনা  
দিলীপ বড়ুয়া দীপু কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশকাল :

২৯ অক্টোবর, ২০১২ ইং  
পবিত্র প্রবারণা পূর্ণিমা  
২৫৫৬ বুদ্ধবর্ষ

কম্পিউটার কম্পোজ :

ভদন্ত মুদিতারত্ন ভিক্ষু  
আবাসিক, শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার,  
মোগলটুলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

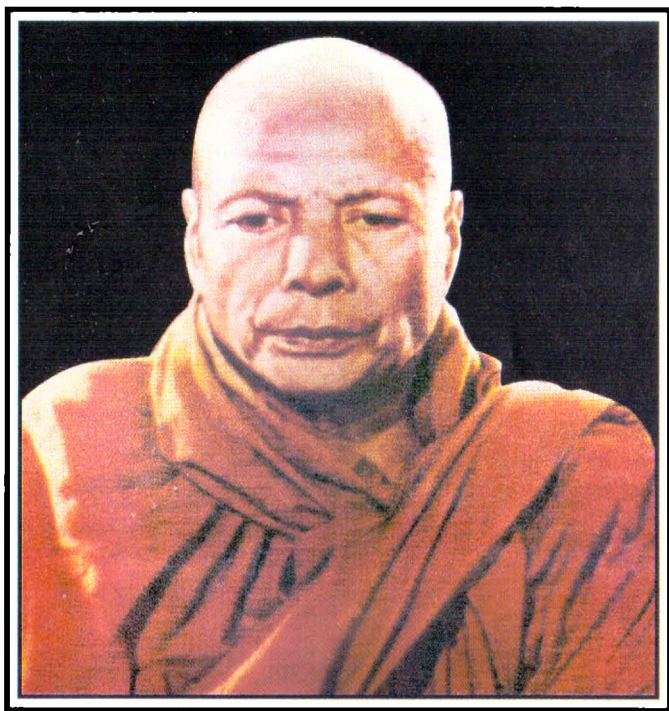
সহযোগিতায় :

ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু  
পরিচালক  
পঃ আধারমানিক শ্মশান ভাবনা কেন্দ্র

মুদ্রণে :

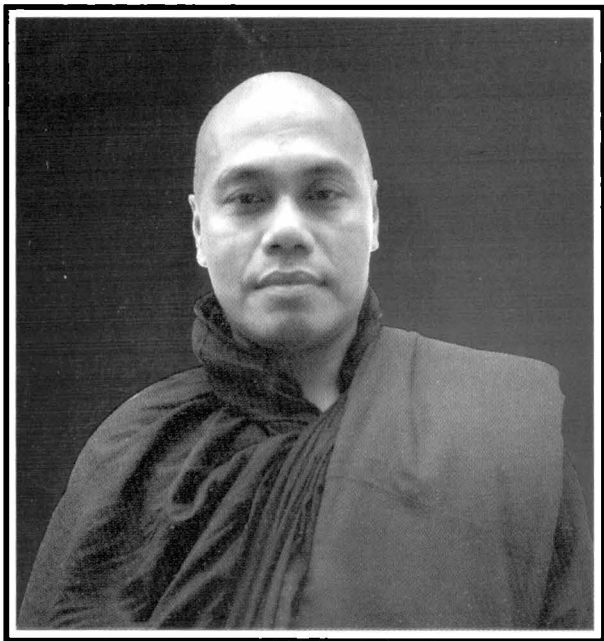
স্মৃতি ডিজিটাল এ্যাড

শ্রদ্ধাদান :- ১৫০ টাকা



**Venerable Mogok Sayadaw**

# উৎসর্গ



## ভদন্ত পঞ্ঞাদীপ থের

পরমারাধ্য গুরু ভন্তে দর্শন ও বিদর্শন আচার্য্য,  
বান্দরবানের বাঘমাঝা বিমুক্তিসুখ ভাবনা কেন্দ্রের  
অধ্যক্ষ ভদন্ত পঞ্ঞাদীপ থের।

যাঁহার পদতলে বসে দর্শন ও বিদর্শন অনুশীলনের  
সৌভাগ্য হয়েছে তাঁহারই নির্বাণ কামনায় উৎসর্গ করা  
হল।

প্রণত :  
দীপু

## অভিমত

মহাকাৰণিক বুদ্ধ বলেছেন পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করা সবচেয়ে বেশী দুঃখজনক। তাই তিনি বুদ্ধত্ব লাভের চূড়ান্ত মুহূর্তে ঘোষণা করেছিলেন :-

অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিসং অনির্বিসং  
গহকারকং গবেসন্তো দুখাজাতি পুনপ্পুনং ।  
গহকারক! দিট্ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি,  
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্না, গহকূটং বিসজ্জিতং,  
বিসজ্জারগতং চিত্তং, তণ্হানং খযমজ্জগাতি ।

গৃহকারকের সন্ধান করতে গিয়ে (যথার্থ জ্ঞানের অভাবে) তাকে না পেয়ে সংসারে অনেক জন্ম পরিভ্রমণ করেছি। পুনঃ পুনঃ জন্ম দুঃখজনক।

গৃহকারক! এক্ষণে আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি। তুমি পুনঃবার গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার সমুদয় পার্শ্বক (বরগা) ভগ্ন এবং গৃহকূট (শীর্ষ) বিচ্ছিন্ন (বিসংস্কৃত) হয়েছে। (আমার) সংস্কার মুক্ত চিত্ত সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করেছে।

বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রুম মূলে বসে বোধিজ্ঞানের চূড়ান্ত নীতি তত্ত্ব প্রজ্ঞানেদ্রে অবলোকন করার সাথে সাথে একত্রিশ লোকভূমি পদ্মপাতার জলের মত প্রকম্পিত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভের বার্তা ঘোষিত হয়েছিল। অবিদ্যা তৃষ্ণাই গৃহকারক। তাহাই দ্বাদশ আয়তন। তাহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর ও দূর্ভেদ্য। কিন্তু দুঃসাধ্য নয়।

এরূপ গুরুগম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ অতিব কঠিন বৌদ্ধ দর্শন মিয়ানমারের অমরাপুরার স্বনামধন্য নির্বাণগত অরহত পরম



শ্রদ্ধেয় মোগোক্ ছেয়াদ (বিমল মহাস্থবির) অতি প্রাঞ্জল ব্রহ্ম ভাষায় আগ্রহী যে কোন যোগী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে মত দেশনা করে গেছেন। এখনকার দিনে এই দেশনাকে মিয়ানমারের ধ্যানীদের নির্বাণের পথ প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করে থাকেন। এ বিষয়ে বেশী কিছু লিখে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটানোই শ্রেয়।

শ্রদ্ধেয় মোগোক্ ছেয়াদ এর উত্তরসুরী বিমুক্তি সুখ সতিপট্ঠান ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, বাঘমারা, বান্দরবানের ভাবনা ভন্তে, দর্শন ও বিদর্শন আচার্য্য পূজনীয় পঞ্ঞাদীপ থের যিনি এক যুগেরও বেশি বিদর্শন সাধনায় ভূতপত্তি লাভ করেছেন। তাঁরই নিকট ধ্যানানুশীলনের সময় শ্রদ্ধেয় মোগোক্ ছেয়াদ এর কুত দেশনার অনুবাদক U Than Daing এর English Version “The Doctrine of Paticcasamuppada” আমাকে বাংলায় অনুবাদ করার অনুপ্রেরণা দেন।

ধর্মীয় ও ভাষাজ্ঞানের সীমা বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ভাবনা ভন্তে র অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পর ভন্তে (শ্রদ্ধেয় পঞ্ঞাদীপ থের) এক পক্ষকাল যাবৎ নিরলস পরিশ্রম করে অরহত ভন্তের বার্মিজ দেশনা বই এর সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ত্রুটিমুক্ত করায় বইটির বঙ্গানুবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভন্তের এই ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সহমর্মীতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। কামনা ও প্রার্থনা করি তিনি নিরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করুক এবং বৌদ্ধ শাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে অস্তিমে পরম সুখ লাভে সক্ষম হোক।

As regards permission from The Society for the propagation of Vipassana for publication of The Doctrine of Paticcasamuppada & Cittanupassana & Vedananupassana By U THAN DAING in Bengali



version, I heartly greatful to Mr. Incharge U Aung Thein A.O for his kind verbal permission.

I am also oblige to Venarable Panny Tiloka Thero of Bangladesh Buddhist Monastary, Myanmar, who have took trouble & represent himself on my behalf to the Society for securring permission.

I earnestry pray & hope that “Edang may punnyan tassa Ashovakhayavahan Hoto.”

পরম শ্রদ্ধেয় শাশান বিহারী ভন্তে শ্রদ্ধাপাল থের এর মাধ্যমে ভাবনা ভন্তের সাক্ষাৎ এর ফলে ধর্মানুশীলনের অবকাশ পাচ্ছি বিধায় ভন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বৌদ্ধ শাসনের পরম হিতকাজ্জি কঠোর পরিশ্রমী ও ত্যাগী নীরব কর্মী শ্রদ্ধেয় মুদিতারত্ন ভন্তে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও বইটি কম্পিউটার কম্পোজ করে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁরও নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাঁর কষ্টার্জিত পুণ্য দুঃখ মুক্তির হেতু হোক।

ধর্মপিপাসু উপাসক/উপাসিকা বর্গ বইটি পড়ে যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে অবিদ্যা তৃষ্ণাই সর্ব দুঃখের মূল তবে আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক মনে করব।

ইতি-

দীপু

## ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্মে সূত্রান্তের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্বগত শিক্ষা। চতুরার্য সত্য শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব পিটকের দ্বিতীয় অবস্থানে অর্থাৎ চতুরার্য সত্যের পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে। যারা স্রোতাপন্ন, সক্দাগামী, অনাগামী ও অরহত মার্গ ও ফল প্রাপ্ত হয়েছেন তারা প্রথমে প্রতীত্যসমুৎপাদ শৃঙ্খল ভেঙ্গে এবং দ্বিতীয়ত চতুরার্য সত্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি বুদ্ধও বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করার পূর্বে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে গভীরভাবে অনুলোম থেকে প্রতিলোম, প্রতিলোম থেকে অনুলোম অর্থাৎ শেষ প্রাপ্ত থেকে প্রারম্ভ, প্রারম্ভ থেকে শেষ প্রাপ্ত। বারবার অনুশীলন সম্পন্ন করে অবশেষে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন সম্পন্ন আসবক্ষয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার সাহায্যে তিনি অবিদ্যা তৃষ্ণাকে সমূলে ধ্বংস করে অবশেষে সর্বজ্ঞ বোধিজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন।

আমাদের গৌতম বুদ্ধও পূর্ববর্তী বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনুরূপভাবে একই ধর্ম তত্ত্বের উপর গুরুত্ব সহকারে গভীরভাবে বারবার অনুলোম থেকে প্রতিলোম, প্রতিলোম থেকে অনুলোম অনুশীলনের মাধ্যমে অবশেষে অবিদ্যা তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটিত করে বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেন। যে তত্ত্ব অভিজ্ঞতায় ভূকম্পন ও অন্যান্য অলৌকিক প্রভাবে একত্রিশটি লোকভূমি প্রকম্পিত হয়েছিল।

ত্রিপিটক এর কিছু কিছু সূত্র ভিন্ন সম্প্রদায় (বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়) দ্বারা সমালোচিত হতে পারে কিন্তু চতুরার্য সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব, বিতর্ক, সমালোচনা এবং সন্দেহের বহু উর্দ্বে।

পট্ঠান (অভিধর্মের সাতটি পিটক) অভিধর্মের বহু উচ্চ স্তরের পুস্তক। শুধু তাই নয় অধিকন্তু যারা অরহত্ব লাভ করেছেন তাদের প্রতিসম্বিদা প্রাপ্ত হওয়া ও সাধারণ ব্যক্তি বর্গের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ এবং সংকায় দৃষ্টি, স্বাশত দৃষ্টি, উচ্ছেদ দৃষ্টি ও অহেতুক দৃষ্টি ধ্বংস করার জন্য পট্ঠান খুবই জরুরী। স্রোতাপত্তি মার্গে উন্নীত হওয়ার জন্য দৃষ্টিসমূহ (মিথ্যাদৃষ্টি)<sup>১</sup> অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ স্রোতাপত্তি মার্গ থেকেই পরবর্তী স্তর সমূহে উন্নীত হতে হয়। ইহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য যে উপরোক্ত চারটি দৃষ্টি পরিত্যাগ করতে পারলে সাধারণ পৃথক জনও পরবর্তী জন্মে অপায় গতিতে পতনের হাত থেকে বিপদমুক্ত হতে পারেন। তিনি সুগতি ভূমিতে জন্মধারণ করবেন যেখান থেকে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাণ সাক্ষাত করতে আর মাত্র সাত জন্ম অবশিষ্ট থাকবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মগ্রন্থের পুনঃজন্ম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য যুক্তি দেয়। যা বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যার দ্বারা সাধারণ ব্যক্তি ও মিথ্যাদৃষ্টির (ভ্রান্ত ধারণা) শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে চতুর্অপায় হতে রক্ষা পেতে পারে। এই তত্ত্বগত শিক্ষায় ইহার বিদ্যমানতায় উহা সংঘটিত হয়। ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি। ইহার যদি বিদ্যমান না থাকে তবে উহার উৎপত্তি সম্ভব নয়। ইহা বিবরণ আকারে প্রদর্শন করা হল ৪:-

ক এর বিদ্যমানতায় : খ বিদ্যমান, ক এর উৎপত্তিতে : খ উৎপন্ন, ক এর নিরোধে : খ এর নিরোধ।

ইহা কারণের কারণ প্রক্রিয়া বা নীতির আদি অন্তহীন সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিবরণ। এই তত্ত্বগত শিক্ষা স্বভাবেই

<sup>১</sup>। যখন দৃষ্টি পরিত্যক্ত হয় তখন বিচিকিৎসা আর অবশিষ্ট থাকতে পারে না। দৃষ্টি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিচিকিৎসাও অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সংগঠিত। বিতর্ক, সমালোচনা এবং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

### প্রতীত্যসমুৎপাদ হল দৃষ্টি বিরুদ্ধান্ত

তত্ত্বগত শিক্ষা স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি ও ইহাদের ফলাফলের বিবরণ প্রদান করে। আগ্রহী ধ্যানীদের উচিত ধ্যানানুশীলনের পূর্বেই স্কন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। মনোযোগী স্কুল ছাত্ররা যেভাবে  $2 \times 2 = 4$  এরূপ গুণ অংকের ১৬ নামতা পর্যন্ত ও ভাগ অংক মুখস্থ করে সেভাবে যোগীগণও একাগ্রতা সহকারে পঞ্চস্কন্ধের ধারণা লাভ করে তবে তিনি তত্ত্বগত শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে অর্থাৎ কার্যকারণ নীতি অবগত হতে সক্ষম হবেন। নতুবা তিনি অনিষ্টকর নানা রকম দৃষ্টি যুক্ত হয়ে চুল্ল স্রোতাপন্ন হতেও সক্ষম হবেন না। নিঃসন্দেহে সত্য যে তিনি মন ও বিষয়ের উপর ধ্যান করে কেবল সদগুণ অর্জন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না কারণ দৃষ্টিসমূহই প্রধান প্রতিবন্ধককারী যা মার্গ বা ফল লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ নিশ্চিত করে বলেছেন এই তত্ত্বগত শিক্ষার সম্পর্কে সম্যক ধারণা ব্যতীত প্রথম স্তর আশা করাও বৃথা।

ঠাপেত্বা পঞ্ঞে দে বোধিসত্তা অঞ্ঞেঞা

সত্তো আত্তনো ধম্মত্তযো পচ্চয় কম্ম

উজ্জুংকতং সম্মত্তুঞ্ঞে নথি

এবং মযহং লোক পচ্চয় করং উজ্জুংকতং

অসাক্কোত্তো দ্বাসট্ঠি দিট্ঠিগত বাসেন গধিজতো হত্ত্বা।

কেবল মাত্র বুদ্ধ ও পচ্চেক বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ নিজস্ব প্রচেষ্টায় (কারো সাহায্য ব্যতীত) প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে সঠিক

নিখুঁত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হননি। কাজেই সাধারণ মানুষ যারা ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি জালে আচ্ছন্ন তারা সুতায় আটকানো বল সদৃশ্য (মঞ্জু তৃণ সদৃশ্য) তারা দুঃখময় সংসার চক্র হতে কোনদিন পালাতে সক্ষম হবেন না।

## ব্রহ্মদেশ ও প্রতীত্যসমুৎপাদ

পুরাতন কালে এই তত্ত্বগত শিক্ষা কেবল মাত্র পালিতে “নিদান বর্গ সূত্র, মহাবর্গ ও বিভঙ্গ (অভিধর্মে) পাওয়া যেত। এই তত্ত্বগত সত্য শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশুদ্ধি মার্গ এবং “সমূহ বিশুদ্ধনী” এ করা হয়েছে। ইহাতে বুঝা যায় যে বিশুদ্ধি মার্গের অনুবাদ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং “সমূহ বিশুদ্ধনী” অপরাপর যুগে কেবল মাত্র তাল পাতায় পাওয়া যেত যা সর্বসাধারণের সহজ পাঠ্যত নয়ই। বরং পালি ছাত্র যা বেশির ভাগ ভিক্ষু ছিলেন, যার কারণে সাধারণত তাঁরা বিহারের গুপ্তীর ভিতরে পবিত্র স্থানে রেখে বুদ্ধ মূর্তির মত পূজা করতেন।

প্রকৃত পক্ষে সমস্ত পালি পাঠ অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার ইত্যাদি বৌদ্ধ নর-নারীগণ মুখস্ত করে অন্তর্নিহিত অর্থ ভালভাবে না বুঝে দৈনন্দিন বুদ্ধের সামনে বন্দনা করার সময় আবৃত্তি করতেন।

পাগান আমল হতে বর্তমান বৌদ্ধ রাষ্ট্র মায়ানমার পর্যন্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই ওখানে কিছু ব্যতীক্রমও আছে যা উপেক্ষণীয়।

কেবল মাত্র মহাথের লেডি ছেয়াদই প্রতীত্যসমুৎপাদকে জনগণের সম্মুখে ধর্মদেশনা ও ব্রহ্ম ভাষায় দীপনি লিখে (ব্যাখ্যা) সর্বসাধারণের বোধগম্য করেছিলেন। ইহাতে উল্লেখ যোগ্য ফলাফল জনগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হল এবং জনগণ ও ক্রমান্বয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদের বিশেষত্বও গুরুত্ব অনুধাবন করতে

সমর্থ হয়েছিল। প্রয়াত মহাথের লেডি ছেয়াদ ৫০টিরও বেশী দীপনি (বই) লিখেছিলেন যার বেশীর ভাগে কম-বেশি প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মায়ানমারের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাল্লির যথার্থ স্বীকৃত রচনাবলীর অনুবাদ পরবর্তীতে খুবই উপকারে এসেছে। তা কিন্তু বুদ্ধ শাসন কাউন্সিলের কৃতিত্ব যার জন্য ধন্যবাদার্থ।

ইহা আরো আনন্দের ব্যাপার যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ধ্যানাগ্রহী ব্যক্তির সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। সে যাহাই হোক ইহা খুবই দুঃখজনক যে প্রায় সমস্ত কেন্দ্র বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে নিজস্ব পরিচিত পদ্ধতিতে ভাবনা পরিচালনা করেন যা কেন্দ্রিয় মর্মবস্তু, অর্থাৎ “সমুদয় ধর্মানুপস্‌সী বিহরতি” সূত্রের সহিত খুব সামান্য মিল অথবা বিদর্শন ভাবনা বিষয়ের সহিত সম্পর্কহীন।’

আরও বেশী দুঃখজনক যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধর্মগ্রন্থ তত্ত্বগত বিষয় যথা- চতুরার্য্য সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ ভাবনা আড়াল করে রাখে। আরও দেখা যায় যে উক্ত দুটি বিষয়ে কোন শিক্ষা বা কোন শব্দ ভাবনা কেন্দ্রে উচ্চারিত হয় না।

ইহা বিন্যস্ত করা প্রয়োজন যে প্রথমে দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ধ্বংস করার জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়ত মার্গ ও ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চতুরার্য্য সত্য তাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে সঠিক স্থানে পরিলক্ষিত হয় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়কে দুর্ভাগ্য জনক ভাবে অবজ্ঞা করা হচ্ছে।

भुवन उदयः स्यात्तः सूर्यः नः भिलगा सूर्यः ।

১। ডিন্ধু কায়, চিত্ত, বেদনা ধর্মের উদয়-বিলয় সংক্রান্ত বিষয়ে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করে বাস করেন।

এখানে একটি বিষয় এই যে গভীর শ্রদ্ধা ও উত্তম সদিচ্ছা সম্পর্কে লেখক ও খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের উল্লেখ না করে উপায় নাই যে, প্রায় সমস্ত ভাবনা কেন্দ্রে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা শমথ ভাবনারই অনুরূপ পদ্ধতি যা আনাপানা স্মৃতি সমাধির গুরুত্ব বহন করে।

ইহা আরও মনস্তাপের বিষয় যে এসব কেন্দ্রের যোগীগণ ঈশ্পিত স্থানে পৌছার পদ্ধতি গত শিক্ষার অভাবে তাহদের অগ্রযাত্রা ভাবনা কেন্দ্র ত্যাগের সাথে সাথেই ঠেকে বা আটকিয়ে যায়। ইহাতে যোগী আনাপানা স্মৃতি সমাধি হতে বিদর্শন ভাবনায় গভীর মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন না।

পূর্বেই বলা হয়েছে নির্বাণগত মহাথের লেডি সেয়াদই এই ধর্মীশাস্ত্রীয় শিক্ষা সাধারণ জনগণের নিকট প্রথম জনপ্রিয় করেছিলেন।

লেডি ছেয়াদ এর পরেই মোগোক্ ছেয়াদ যিনি কেবল মাত্র প্রতীত্যসমুৎপাদকে পুনঃ উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেননি তদুপরি তিনি দৃষ্টি পরিত্যাগকারী মৌলিক শক্তি তত্ত্বগত শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনিই সহজ পদ্ধতি ও অধিক বোধগম্য যোগ্য প্রক্রিয়ায় কি ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র বিপ্লব ঘটায় এবং কি ভাবে সংসার শৃঙ্খলভঙ্গ করার কার্যক্রমে সক্রিয় হয় তা অতি নিখুত ভাবে চিত্রের সাহায্যে পরিকল্পিত ভাবে প্রচলন করে গেছেন।

পাঠক বর্গের বড়ই উপকার হবে যদি মোগোক্ ছেয়াদের জীবনের উপর ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি ৩০ বৎসরেরও বেশী সময় মান্দেলে থেকে সাত মাইল অদূরে অমরাপুরা মঙ্গল বিহারে পরিয়ন্তি শাসনের উন্নতির প্রয়াসে ভিক্ষুদের জন্য অভিধর্মের উপর রাত্রি কালীন ক্লাস (এণ্ডাবা) রাত্রিকালীন অভিধর্ম দেশনা করতেন। তিনি “Than daing” লেখককে বলতেন



একদিন তাহার মনে পড়বে যে তিনি কেবল মাত্র রাখাল, গরু চড়ানো সত্বেও গরুর দেওয়া দুধ উপভোগ করার সুযোগ হয়নি।

তখনকার দিনে মোগোন্স্ ছেয়াদ ভিক্ষু সংঘের নিকট অভিজ্ঞ পিটকের অন্তর্গত পাট্ঠান ও যমক বর্গের স্বনামধন্য বিখ্যাত আশ্চর্য হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

একদিন মান্দেলীর অপর পাশ্বে মিনগুন যাত্রা করেন এবং তথায় তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত গভীর ভাবে বিদর্শন ধ্যানে রত ছিলেন। মোগোন্স্ অঞ্চলের জনগণ তাঁকে মোগোন্স্ যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ছেয়াদ মোগোন্স্ স্থায়ী ভাবে বসবাস না করে শীতকালে অমরাপুরায় ফিরে আসেন এবং গ্রীষ্মে ফিরে যান। যুদ্ধের শেষে তিনি ছেয়াদ অমরাপুরা মোগোন্স্ ও মান্দেলে বিদর্শন ধ্যান সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দেওয়া আরম্ভ করেন। তিনি জনপ্রিয়তা পরিহার করতেন তাহার অনুসারীদের পরিধি বিস্তৃত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি একবার মাত্র রেঙ্গুন ভ্রমণ করেন এবং রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার তিন মাস পরে অমরাপুরায় দেহত্যাগ করেন।

সঙ্গত কারণে তাঁকে সাধারণত অরহত বলে বিশ্বাস করা হয় কারণ ছেয়াদ এর দাহকৃত স্থানে তাঁর দেহাবশেষ ধাতুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়ায় এত জনসমাগম ও এত চমৎকার হয়েছিল যে একশত বৎসরের মধ্যে এরূপ জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আর হয়নি। তাঁর অন্তর্ধান জনিত মহৎ ক্ষতি শাসনে পূরণ হওয়ার নয়।

ছেয়াদ এর পদ্ধতি ও শিক্ষা পুজ্যানুপুজ্য রূপে সতিপট্ঠান এবং বিভিন্ন সূত্র, সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায় ও আর্য্যসত্যের সহিত সুসঙ্গত বা মিল রয়েছে। তিনি কেবল শিক্ষা দেননি—গভীর মূলে পুথিত ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস বা কল্পনা থেকে নিবৃত্ত

থাকার জন্য ব্যাখ্যা, রূপান্তর, সংশোধন এবং পুনঃ সংস্কারও করে গিয়েছেন। উপমা স্বরূপ বলা যায় প্রকৃত পক্ষে সাতিপট্ঠান সূত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে সচ্চ পর্ব সহ প্রত্যেকটিতে বিদর্শনের মর্মবস্তু রয়েছে। যেমন সমুদয় ধর্মানুপস্‌সি বিহরতি, বয় ধম্মানুপস্‌সি বিহরতি, সমুদয় বয়ধম্মানুপস্‌সি বিহরতি। যার অর্থ হল এই যোগীকে অবশ্যই দৃষ্টির বিষয় বস্তুর উদয়-বিলয় কার্যক্রমের উপর ধ্যানানুশীলন রত থাকতে হবে। ইহা স্বয়ং বিদর্শন। সোজা কথায় ইহা ছাড়া বিদর্শন অচল। সাতিপট্ঠান সূত্র বিদর্শনের খুবই দরকারী ও প্রয়োজনীয় মর্মবস্তু বলা যায় যে সাতিপট্ঠান সূত্রের এই অংশটুকুকে প্রত্যেকটি ভাবনা কেন্দ্রে দুঃখজনক ভাবে অবজ্ঞা করা হয়।

আনাপানা স্মৃতি খুবই জনপ্রিয়, এমন কি ছোট শিশুরাও ইহা জানে। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় পদ্ধতি হল আর্যপথ। এখনো অনেক বৌদ্ধ শমথ ও বিদর্শনের পার্থক্য বুঝতে পারেন না

যখন সতর্কতা, একাগ্রতা অথবা কোন কিছুই আনাপান বা আর্যপথে নিয়োজিত থাকে না তা শমথ। যতক্ষণ পর্যন্ত সমুদয় বয়ধম্মানুপস্‌সি হয়ে অর্থাৎ উদয়-বিলয় অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করবে না ততক্ষণ বিদর্শন ভাবনা অনুশীলিত হবে না। প্রকৃতভাবে বলা যায় যোগীকে আনাপানা স্মৃতিকে নিরক্ষণ ও গভীরভাবে মনযোগী হতে হবে। যখন যোগী প্রতিটি ক্ষণ (সেকেন্ড) মূহুর্তে (মিনিট) স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয়ের প্রকৃতিকে জ্ঞান নেত্রে নিরক্ষণ করার চেষ্টার রত থাকবেন তখন বলা যায় যে তিনি প্রকৃত বিদর্শন অনুশীলনে রত আছেন। যদিও বা উদয়ও ব্যয় বা সমুদয় ও ব্যয় আনাপানার উপাদান- যা বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই উদয়-ব্যয় এর প্রকৃত উপাদান অন্ধকার ছদ্মবেশে আশ্বাস-প্রশ্বাসই।

মহাথের এর জীবনের শেষ ভাগে সাধারণ মানুষকে ভগবান বুদ্ধের বিশুদ্ধ বিদর্শন শিক্ষার শিক্ষিত করে সত্য পথে আনার প্রচেষ্টা করেছিলেন।

প্রকৃত সত্যকথা হল মহান শিক্ষকের মহান শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যেমন তান্ত্রিক, মন্ত্রিক, মিষ্টিক (ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধযুক্ত), প্রেতাত্মা বিশ্বাসী, ও ব্রাহ্মবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করল। ইহাতে মায়ানমারের বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মদেশের বৌদ্ধধর্মে রূপ ধারণ করল। বার্মিজদের দেনন্দিন জীবনে বহু ব্রাহ্মদেশীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রত দৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়ে ঘুরপাকে পতিত হল। যদিও বা ধ্যানে ইহার প্রয়োগ সম্পর্কে বলা ভুল হবে না- তাহাদের বেশীর ভাগ যোগীর আনাপান স্মৃতির সমাধির অগ্রগতি অর্ধ পথে রোধ হয়ে যায় যেখান স্তর হতে সঠিক ও বিশুদ্ধ বিদর্শন সাক্ষাত সম্ভব হয় না। প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ এর লক্ষ্যদিন ও অভিপ্রায় ছিল এধরণের অবৌদ্ধজনিত মনবৃত্তি সংশোধন ও পুনঃসংস্কার করা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টি-চিহ্নিত করার। যেমন - (১) মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে দান দেওয়া বা শীল গ্রহণ করা হতে বিরতি এবং ইচ্ছুক যোগীদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ জ্ঞাত বা বিধিত করা। সর্বপ্রথম অতীব প্রয়োজন- শাস্ত্রত, উচ্ছেদ, অক্রিয়া, অহেতুক দৃষ্টিসমূহ যোগীদের মন থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত করা।<sup>১</sup>

(২) বিদর্শনে গভীর ভাবে মনোযোগ দেওয়ার আগে জ্ঞাত পরিজ্ঞান। প্রতীত্যসমুৎপাদ শিক্ষা করে তা করা যায়। দ্বিতীয়ত উদয়-বিলয়ে মনোযোগ করার আগে আশ্বাস-প্রশ্বাস অনুশীলনের দ্বারা সত্যের অনুকূল জ্ঞান লাভ করতে সহায়ক নয়। একই ভাবে নাম-রূপের উদয়-বিলয় এর গতিবিধি গভীর ভাবে নিরক্ষণ না

<sup>১</sup>। Meritorious deeds, প্রসংশনীয় কাজ অর্থাৎ দান করা ও শীল পালন করা হয় পরবর্তী জন্মে মহারাজা, দেবরাজ ইত্যাদি রূপে জন্ম লাভ করার জন্য।

করে কায়িক-মানসিক গতি-বিধির উপর নজর রাখা। মোগোক্ ছেয়াদ অনিচ্ছা, দুক্খা ও অনাত্ম এর প্রতি গভীর জোর দিয়েছেন। যখন পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয়ের উপর গভীর ভাবে ধ্যানীর মনোযোগ নিবিষ্ট হয় তখন তাকে শতকরা একশত ভাগ বিদর্শন ধ্যান বলা যায়। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে বলা যায়—যেখানে প্রথম ধ্যানে, উদয়-বিলয় এর প্রতিগভীর মনোযোগ নাই তাকে শতভাগে সঠিক বিদর্শন বলা যায় না। সাতিপট্ঠান সূত্রে ব্যাখ্যা মতে সমুদয় এবং বয় ছাড়া বিদর্শন ধ্যান অসমাপ্ত ও বোধগম্য নয়। ইহাই প্রধান দুটি বিষয় যথা আর্যসত্য এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব প্রচার, প্রসার, পুনঃউজ্জীবিত ও কার্যকরী করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।<sup>১</sup>

উপসংহারে আসার আগে লেখক গভীর পরম শ্রদ্ধেয় ছেয়াদ অগ্রমহাপণ্ডিত সীথিল ভন্তে যিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে ও প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ছেয়াদয়ের ঐকান্তিক সহযোগীতায় ইংরেজী বানান ও পালি শব্দ বিন্যাস নির্ভুল ও আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

তারিখ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

U Than daing

রেঙ্গুন, বার্মা

President

Society for the propogation of mogak vipassana.

<sup>১</sup>। Nata prinna must come triana prima (জ্ঞাত পরিজ্ঞান তীরণ পরিজ্ঞান সাধন করায়) অথবা অন্যভাবে বলা যায় বিদর্শন ভাবনার প্রথম পদক্ষেপ প্রথমে আসতে হবে এবং দ্বিতীয়ত আগ্রহী যোগীগণের স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পর প্রকৃত ধ্যান সাধনা আরম্ভ করতে হবে। উপযুক্ত বিদর্শন আচার্য্যের উপদেশ শুনে অনাকাজ্জিত ভ্রান্ত ধারণা মুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। একান্ত ভাবে জেনে রাখা উচিত তিন পর্যায়ে দৃষ্টিকে পরিত্যাগ করা যায়। যেমন— (১) উপযুক্ত গুরু হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। ইহাকে জ্ঞাত পরিজ্ঞান (২) প্রকৃত অনুশীলনে (তীরণ জ্ঞান) প্রবেশ করে (৩) সমূলে উচ্ছেদ করে (প্রহাণ পরিজ্ঞান) এসব কিছু আবার তদাঙ্গ প্রহান, বিখন্ডন প্রহান এবং সমুচ্ছেদ প্রহান নামে পরিচিত।

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। প্রতীত্যসমুৎপাদ কাকে বলে.....	০১
২। সংযুক্তি, উৎপাদক (কারণ).....	০৫
৩। স্কন্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ (বর্তমান অবস্থা).....	১০
৪। কিভাবে বেদনা থেকে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র ঘূর্ণয়ন আরম্ভ করে....	১৮
৫। প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বে প্রারম্ভিক পরিক্রমা.....	২১
৬। প্রতিলোম হতে কার্য্যকারণ নীতির গতি বিধি.....	২২
৭। বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের অবর্তমানে সংসার.....	২৩
৮। অনুলোম ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ.....	২৬
৯। প্রতীত্যসমুৎপাদের মূল কারণ.....	৩৩
১০। প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র ভঙ্গ করার উপায়.....	৩৬
১১। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারী কে?.....	৪০
১২। বিপরীত ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ বিন্যাস.....	৪৮
১৩। সৎকায় দৃষ্টির কারণ ও পরিণাম.....	৫৬
১৪। সৎকায় দৃষ্টির উৎপত্তি.....	৫৯
১৫। বিদর্শন ভাবনা.....	৭১
১৬। চিত্তানুপস্সনা <del>এ</del> <b>ত্রৈলোক্য</b> .....	৭৫
১৭। মিথ্যাদৃষ্টি বর্জনের উপায়.....	৮০
১৮। দৃষ্টিসমূহের ধ্বংস করার প্রক্রিয়া.....	৮৩
১৯। চিত্তানুপস্সনা.....	৮৮
২০। অরহত ও পৃথকজন.....	১০১
২১। বেদনাস্কন্ধ ও প্রতীত্যসমুৎপাদ.....	১০৯
২২। টিকাপুঞ্জ.....	১২৩

## প্রথম অধ্যায়

### প্রতীত্য সমুৎপাদ কাহাকে বলে?

প্রতীত্য সমুৎপাদ হল পালি ভাষা যাহা পটিচ্চ অর্থ মূল কারণ, সং (সম) অর্থ যথার্থ সমন্বয় তিন শব্দের সমন্বয়ে গঠিত; যথা- “পটিচ্চ” অর্থ মূলকারণ, সম অর্থ সুসমন্বিত, উপাদ অর্থ ফল উৎপন্ন। সুতরাং প্রতীত্য সমুৎপাদ অর্থ কারণ সুসমন্বিত ফল উৎপত্তি। যাকে ইংরেজীতে Law of dependent Origination পরস্পর নির্ভরশীল মূল উৎস বা Cycle of Rebirth পুনঃ উৎপত্তি চক্র বলে।

পরস্পরের কারণে উৎপত্তি সূত্রে বারটি সংযোগকারী অঙ্গ (প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রবর্তীত উদয় বিলয় স্রোত ধারা) যা আদি-অন্তহীন সংসার চক্রের বিচরণে প্রবাহিত।

যদিও বা ইহা অবিদ্যা দিয়ে আরম্ভ কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রথম কারণ সংসারের প্রারম্ভ আদি-অন্তহীন। অবিদ্যাচ্ছন্ন ঘূর্ণিয়মান সংসার চক্রের উৎপত্তির মূলকারণ অবিদ্যার (অজ্ঞানতার) উৎপত্তির কেন্দ্র বিন্দু। নিরূপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতীত্য সমুৎপাদ শিক্ষা দেয় সংসার চক্রের হেতু হল কার্য কারণের পর্যায়ক্রমিক ফল, অথবা যথায়থ ভাবে বলা যায় কারণ বা হেতু ফলাফলে পরিণত হয় এবং ফলাফল মহাজাগতিক কর্মের, লোকধাতুর কালক্রমে কারণ বা হেতুতে পরিণত হয়।

দ্বাদশ সংযোগ প্রতীত্যসমুৎপাদ গুলি নিম্নরূপ :-

- ১। অবিদ্যার (অজ্ঞানতা) কারণে সংস্কার (কর্ম) উৎপত্তি হয়
- ২। সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান) উৎপন্ন হয়

- ৩। বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ উৎপন্ন হয়
- ৪। নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়
- ৫। ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ (পরস্পর সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়া) উৎপন্ন হয়
- ৬। স্পর্শের কারণে বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয়
- ৭। বেদনার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়
- ৮। তৃষ্ণার কারণে উপাদান (দৃঢ় আসক্তি) উৎপন্ন হয়
- ৯। উপাদানের কারণে কর্মভব উৎপন্ন হয় [কর্মভব-উৎপত্তিভব (পুনঃ জন্ম) কায়-বাচনিক, মানসিক]
- ১০। কর্মের কারণে জন্ম উৎপন্ন হয়
- ১১। জন্মের কারণে জরা, মরণ উৎপন্ন হয়
- ১২। জরা-মরণের কারণে শোক, পরিদেবন কায়িক দুঃখ মানসিক দুঃখ, উপায়াস কেবল দুঃখের কারণ গুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয়

এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়তত্ত্ব পালি ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করা একান্তই কর্তব্য।

যারা এখনো প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব শিক্ষা করেন নি তারা অতি তাড়াতাড়ি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে সহায়ক হবে। কেউ কেউ ত্রিরত্ন বন্দনার সময় প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি পালি আবৃত্তি করে থাকেন। তাতে তাদের পূর্ণ সঞ্চয় হয় বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে আবৃত্তি করলে কখনও দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

ইহা সহজে অনুবোধ করা যায় যে এই ধর্মীয় তত্ত্ব আর কিছুই নয় আপনি নিজেই, অর্থাৎ আপনার নিজস্ব নাম-রূপ, স্কন্ধ বিশেষ, হাঁ, ইহা তার চেয়ে আরও বেশী প্রতীয়মান হয় যে



অবিরাম অগোচরের কারণে নিজেরই আবর্তন মাত্র। অর্থাৎ নাম-রূপের উদয়-বিলয় অথবা অন্যথায় দুঃখ-দৌমনস্যের নিরবিচ্ছিন্ন জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে প্রতীত্যসমুৎপাদ নিজেই ধর্ম বা স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয়ের অনুচক্র যা পুরাণো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে নতুন ভাবে অন্তর্হীন গতি সঞ্চার করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের এরূপ উৎপত্তি বিলয়কে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং প্রতীত্যসমুৎপন্ন যার কার্যক্রম কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর আরম্ভ বা রোধ করতে সক্ষম নয়। এই কার্যক্রমই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব পুনঃ সংযোজিত করে।

কেবল মার্গই এক মাত্র ধর্ম যা প্রতীত্যসমুৎপাদের সংযোজন ছিন্ন করতে সক্ষম এবং যেখানেই পুনঃ সংযোজন থেমে যায় সেখানেই নির্বাণ।

প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রকৃতির গতানুগতিক পদ্ধতিতে স্কন্ধসমূহ বা নাম-রূপের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি বা জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বা পক্ষান্তরে বলা যায় ওখানে “আমি” “আমার”, আত্মার সহিত অনুরূপ তুলনা করার কিছুই নাই। ওখানে স্কন্ধসমূহ, নাম-রূপ বা অনাত্মার উৎপত্তি বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নাই।

১। আদি সংসার চক্রানুসারে ব্যবহারিক সত্য মতে সত্ত্ব, প্রাণী, আত্ম থাকলেও মূলত প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব মতে অবিদ্যা-তৃষ্ণাই সংসার চক্রের প্রবর্তক। ইহা মানুষের জীবনের আদি বা প্রথা বা প্রধান কারণের সহিত তুলনা করা উচিত নয়। পরমার্থিক সত্য মতে মানুষ ও মানব সমাজ জীব জগত বলতে কিছুই নাই এবং এভাবে যদি পশ্চাত অনুধাবন করে দেখতে পাই যে, ধর্ম অর্থাৎ অবিদ্যা এবং তৃষ্ণাই সংসার চক্রের দাবিদার।

২। ইহা অনুমেয় যে, অবিচ্ছিন্ন স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয়ধর্মী আদি অন্তর্হীন কর্ম প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয় যাহা তথাকথিত

সচেতন জীবকে সমুদয় সত্যমতে মানুষ, স্ত্রী, প্রাণী রূপে অবহিত করে থাকে ।

৩। মনে পরিস্কার ধারণা জন্মে যে, পরমার্থ সত্য মতে পুরুষ, স্ত্রী, প্রাণী বলতে কিছুই নাই। এই রূপে তত্ত্বনিয়মের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, “ইহার কারণে উহা উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপত্তির কারণে উহার উৎপন্ন ঘটে। যখন ইহার নিরোধ হলে- উহাও নিরোধ হয়। অর্থাৎ ইহা হলে উহা হয়- ইহা না হলে উহাও হয় না।

৪। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সংস্কার, বেদনা, কর্মভব এবং জাতি অর্থাৎ জন্ম একে অপরের সহিত একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট।

৫। ইহার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় নিরবিচ্ছিন্ন চক্রাকারের পুনঃ জন্ম, জাতি, বার্ষিক্য, ব্যাধি এবং অস্তিমে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পুনঃ জন্ম, ব্যাধি, বার্ষিক্য এবং মৃত্যু অনাদ্যন্তভাবে সংগঠিত হচ্ছে। ফলন্ত বৃক্ষ যেমন ফলদান করে, আবার সেই ফল হতে বীজের মাধ্যমে চারা গাছ উৎপন্ন করে এবং সে চারা গাছ যেমন পুনরায় বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফল ও বীজ উৎপাদন করে এবং এভাবে আদি অন্তহীন অপরিমেয় উৎপত্তি রহস্য প্রক্রিয়া অবিরাম চক্রাকারে প্রবাহমান।

৬। পরিলক্ষিত হয় যে উৎপত্তি বিনাশ আর কিছুই নয় কেবল মাত্র দুঃখ এবং কষ্টেরই শ্রেণী বিন্যাশ।

৭। এসব কিছু জ্বালানি সামগ্রীর ভাণ্ড ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ সদৃশ্য। যখন জ্বলন্ত আগুনে তেল নিক্ষেপ করা হয় আগুন তখন আগুন ও তেলের ক্ষমতা অনুসারে অত্যন্ত উত্তপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরী করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বলন্ত আগুনে অবিরাম তৈল সংযোজিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আগুন জ্বলতেই থাকবে- ইহার কোন অন্তসাধন হবে না।

৮। কেবল মাত্র আর্ষসত্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত সমুদয় সত্য এবং দুঃখ সত্য চলমান প্রক্রিয়াকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব।

৯। বর্ত তিনটি নিজস্ব পথে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হচ্ছে যথা ক্লেশ বর্ত, কর্মবর্ত, এবং বিপাক বর্ত। ক্লেশ বর্তের কারণে কর্ম বর্ত উৎপন্ন হয় এবং কর্ম বর্তের কারণে বিপাক বর্তের উৎপত্তি।

১০। ওখানে কেবল কাল এবং স্থান বিবর্তনের অনুচক্রিক কার্যকারণ। অর্থাৎ অতীত বর্তমানও ভবিষ্যত। পাঠক বর্ণের স্পষ্টত প্রতীয়মান হবে যে, বর্তমান অতীতে পরিণত হবে এবং ভবিষ্যত পুনরায় বর্তমানে রূপান্তরিত হবে। এরূপ নিরবিচ্ছিন্ন সংসার প্রক্রিয়ার অনুচক্র আদিঅন্তহীন ভাবে চলতেই থাকবে।

-----○-----

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বিভাগ, সংযুক্তি, উৎপাদক (কারণ এবং কাল)

এই অধ্যায়ে মনোনিবেশ করার আগে চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ক) চিত্রের মধ্যখানে অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা দুই মূলের স্থান।

খ) দুটি সত্য বিদ্যমান (১) সমুদয় এবং দুঃখ যেহেতু ইহা বর্ত দেশনা, অন্য দুই সত্য হল যথা মার্গ ও নিরোধ যা অবিদ্যার (অজ্ঞানতা) দ্বারা আচ্ছাদিত।

গ) তা আবার চার ভাগে বিভক্ত যথা- (১) অতীত হেতু প্রত্যয় (২) বর্তমান ফল (৩) বর্তমান হেতু প্রত্যয় (৪) ভবিষ্যত ফল বিদ্যমান।

ঘ) বিশটি বিষয় সেখানে বিদ্যমান। যথা- ১। অতীত হেতু প্রত্যয়। যথা- অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব। ২।

বর্তমান ফলাংশে যথা- বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ এবং বেদনা । ৩ । বর্তমান হেতু প্রত্যয়ে যথা- তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা এবং সংস্কার এবং ৪ । ভবিষ্যত ফলাংশে যথা- বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা ।

ঙ) বারটি সংযোগ তথায় বিদ্যমান- অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি জরা-মরণ

চ) তিনটি কাল- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

ছ) তিনটি বর্ত- ক্লেশ বর্ত, কর্ম বর্ত, বিপাক বর্ত

জ) তিনটি সংযোগ- ১) অতীত কার্য কারণে বর্তমান ফল ২) বর্তমান কার্য কারণে বর্তমান ফল এবং ৩) বর্তমান কার্য-কারণ বশতঃ ভবিষ্যত পরিণাম ফল ।

সর্বজ্ঞ বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন যে স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয় প্রক্রিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বিপরিনাম পরম্পরা হেতু পরবর্তী প্রত্যয়ের উপস্থিতিতে পূর্ব প্রত্যয় তিরহীত হয়ে বিলুপ্ত হয় ।

নির্বাণ প্রাপ্ত অরহত পরম শ্রদ্ধেয় মোগোক্ ছেয়াদ গভীর মনোযোগের সহিত স্কন্ধসমূহকে নিরীক্ষণ করে সংযুক্ত চিত্র অংকন করেছেন । সুতরাং যোগীগণের বোধগম্য হবে যে প্রতীত্যসমুৎপাদ আর কিছুই নয় কেবল মাত্র নিজের স্কন্ধসমূহ এবং স্কন্ধসমূহ কিছুই নয় কেবল মাত্র উদয়-বিলয়ের প্রক্রিয়া মাত্র । উদয়-বিলয়ের প্রক্রিয়া হল দুঃখ সত্যেরই প্রক্রিয়া ।

কাজেই স্কন্ধ বলতে দুঃখকে বুঝায়। দুঃখ বলতে স্কন্ধকে বুঝায়। এই স্কন্ধসমূহকে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।<sup>১</sup>

কেবল মাত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্ঞাত হলে শাস্ত্রত, উচ্ছেদ ও সংকায়দৃষ্টি মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং ধ্যানীদেরকে উদ্ধুদ্ধ করা যাচ্ছে যে জ্ঞানের দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন। স্কন্ধ সমূহ কি প্রদর্শন করে? কি ব্যক্ত করে? কি অভিপ্রায় জানায়? এবং কি নির্দেশনা প্রদান করে?

নীচে শ্রদ্ধেয় ছেয়াদ এর উক্তি প্রদান করা হল-

অবিদ্যা তৃষ্ণামূল, উপাদান কর্মের কারণে নাম-রূপ, বৃক্ষের বীজ- বীজের বৃক্ষ উপমা স্বরূপ অবিচ্ছিন্ন রূপে কর্মের নাম-রূপ, নাম-রূপে কর্ম পুনঃ পুনঃ উদয় হয়। উপসংহারে উপনীত হতে হবে যে ব্রহ্ম শত্রু ঈশ্বর দ্বারা দেব-মনুষ্য সত্ত্বগণ সৃষ্ট নহে এরূপ পরিজ্ঞাত হোন।

মহামহিম আনন্দ খের সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে বলেছিলেন বড়ই আশ্চর্য্য ভান্তে, বড়ই অদ্ভুদ ভান্তে। এরূপ গম্ভীর অবভাস (দীপ্তি) পূর্ণ প্রতীত্যসমুৎপাদ। অথচ আমার নিকট অতি অগভীর বোধ হচ্ছে। ইহা শুনে বুদ্ধ বললেন- আনন্দ এরূপ বলবে না, এরূপ বলবেনা, এরূপ বলবেনা। আমরা সুদীর্ঘকাল ইহা বুঝতে না পেরে বিজরিত তন্ত্র জটিলভূত সূত্রপিণ্ড ও মুঞ্জত্ব তুল্য অপায় অতিক্রম করতে পারিনি। দূর্গতি ভোগ হতে পরিত্রাণ পাইনি। অসুরাদি কুলে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এসব কারণে সংসারকে অতিক্রান্ত করে পুনঃ জন্ম রোধ করতে পারিনি। কাজেই জরা-মরণের প্রকোপ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল সেই কারণেই।

<sup>১</sup>। দুই মূল, দুই সত্য, চারি অংশ, দ্বাদশাঙ্গ স্বভাবার্থ সহ, ত্রি-সংযোগ ত্রি-বর্ত, দুই অন্তমূল, ত্রি-কাল, বিংশ বিষয় এই আটসুর সূত্রকে জেনে নিও যোগীগণ দুঃখময় সংসার বিচরণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়।

আনন্দ বিভিন্ন প্রকার ভেদে প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মকে তুমি যদি অগভীর মনে কর তবে চারি অসংখ্য একলক্ষ কল্পকাল আট অসংখ্য এক লক্ষ কল্পকাল। ষোল অসংখ্য এক লক্ষ কল্পকাল পারমী পূর্ণ করে সর্বজ্ঞ আমরণ জ্ঞান কেন লাভ করতে পারেনি? তুমি যে উক্তি করেছ তা জ্ঞানীদের মত নয়। অত্যন্ত গভীর তত্ত্বপূর্ণ এই প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মকে সহজ মনে করেছ। ভিক্ষুদের কোনদিন বুদ্ধের দেশিত ধর্মের বিপরীত মন্তব্য করা উচিত নয়।

ভিক্ষুগণ, আমি প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্বকে জানার জন্য চারি অসংখ্য এক লক্ষ কল্প গত করেছি এই ধর্মকে জানার জন্য এমন কোন বস্তু নেই যা আমি দান করিনি। সমস্ত মার সৈন্যকে জয় করার সময় পারমী পূর্ণ করা সত্ত্বেও এই মহা পৃথিবী দুই আঙ্গুল পরিমানও কম্পিত হয়নি। ত্রিযামের প্রথম ভাগে পূর্বনিবাস জ্ঞান লাভ করতে দুই আঙ্গুল পরিমানও মহা পৃথিবী কম্পিত হয়নি। মধ্যম যামে দিব্য চক্ষু জ্ঞান লাভ করার সময়েও পৃথিবী কম্পিত হয়নি। অন্তিম যামের শেষ ভাগে প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মকে জ্ঞাত হওয়ার পর দশ সহস্র চক্রবাল লোক ধাতু প্রকম্পিত হয়ে পদ্ম পাতার জলবিন্দু সদৃশ্য কম্পন সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে আনন্দ এই প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি তত্ত্বকে অগভীর বলবে না।

এজন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে যে এই ধর্ম গ্রন্থের সত্য বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবসর সময়ে গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণা করলে নিম্নলিখিত উপকার অর্জিত হবে-

১) যখন যোগী প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বে মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন তখন উদয়-বিলয়ের গতিবিধি সম্যকদৃষ্টি দিয়ে দেখতে সক্ষম হবেন, অর্থাৎ, যখন স্কন্ধসমূহের উদয় প্রক্রিয়া ধর্ম নিয়মানুসারে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন তখন উচ্ছেদ দৃষ্টি বা

ভ্রান্তধারণা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যখন পুরাতন স্কন্ধসমূহের বিলয়ের প্রক্রিয়া এবং নতুন স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধ হবে তখন কার্য্যকারণে নিয়ম অনুসারে স্বাশত দৃষ্টি সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল হয়ে যাবে।

যখন যোগী উৎপত্তি ও বিনাশের কার্য্যক্রমের প্রক্রিয়া পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হবেন যে, উৎপত্তি বিনাশ প্রবাহ আর কিছুই নয় কেবল মাত্র কার্য্যকারণ নীতি যাতে প্রাণী, মানুষ, স্ত্রীলোক আত্মা বলতে কিছুই নেই তখনই যোগী আত্মার ছদ্মাবরণ অর্থাৎ ভ্রান্তধারণা হতে অথবা সংকায়দৃষ্টি হতে সাময়িক মুক্ত হতে পারবেন। (তদাঙ্গন প্রহান)

২) রূপ-নাম বিভাগ করে জ্ঞাত হয়ে এই নাম ও রূপের উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যোগীর প্রত্যয় পরিগ্রহ জ্ঞান।

৩) যখন বিশদ ভাবে জ্ঞাত হওয়া যাবে যে সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্য-কারণ বশতঃ অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও সংস্কার এর কারণেই পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) এর উৎপত্তি তখন যোগী (ক) ঈশ্বরনির্মান দৃষ্টি (খ) অক্রিয়া দৃষ্টি এবং (গ) অহেতুক দৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করতে সক্ষম হবেন।

৪) প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান উপলব্ধির কারণে যোগী জ্ঞাত হবেন যে স্কন্ধসমূহ আর কিছুই নয় নাম-রূপের ক্রমবর্ধমান ও বিরাম-হীন উৎপত্তি ও বিনাশের সমষ্টিগত প্রক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান কার্য্য ক্রম।

পরিশেষে যোগী ভাবনাময় জ্ঞান অর্জন করে উপলব্ধি করবেন যে পঞ্চউপাদানস্কন্ধ কেবল মাত্র দুঃখ কষ্টেরই সমষ্টি।



যখন যোগী উপরোক্ত চারটি বিষয়ে জ্ঞাত হতে সক্ষম হবেন তখন যোগী তদাঙ্গ প্রহান (সাময়িক) ভাবে অপায়গতিতে পতনের বিপদ মুক্ত হবেন।

আগ্রহী যোগীদের উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে প্রকৃত ধ্যানে প্রবেশ করার আগে এই ধর্মশাস্ত্র বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন যাতে তাঁরা শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞা ও বীর্য অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের ফল লাভ করতে সক্ষম হন।

-----○-----

## তৃতীয় অধ্যায়

### স্কন্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ

বিদর্শন অনুশীলন ইচ্ছুক যোগীদের উপকারার্থে প্রয়াত মোগোক্ ছেয়াদ স্কন্ধ ও প্রতীত্যসমুৎপাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের গভীর বিষয়ের তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের সংক্ষিপ্ত পথ নির্দেশনা যা বিদর্শন চর্চাকারীকে স্মৃতি অনুশীলনে সহায়ক হিসাবে গণ্য করা যায়। যোগীরা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের সহায়তার স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয় জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

১। চক্খুং পটিচ্চ রূপেচ উপ্পজ্জতি চক্খু বিঞ্ঞানং। তিন্ণং সঙ্গতি ফস্সো। ফস্সো পচ্চয়া বেদনা। বেদনা পচ্চয়া তন্হা। তন্হা পচ্চয়া উপাদানং। উপাদান পচ্চয়া ভবো। ভবো পচ্চয়া জাতি। জাতি পচ্চয়া জরা, মরণং, সোক, পরিদেব, দুক্খ, দোমনস্স উপায়াসা সম্ভবন্তি দুক্খক্খন্স্স সমদযো হোতি।

২। সোতঞ্চ পটিচ্চ সদ্দেচ উপ্পজ্জতি সদ্দে বিঞ্ঞাণং। তিন্ণং সঙ্গতি ফস্সো। ফস্সপচ্চয়া খন্স। তিন্ণং.....সমুদযো হোতি।

৩। ঘানঞ্চ পটিচ্চা গন্ধেচ উপ্পজ্জতি ঘান বিঞ্ঞাণং তিন্ণং.....সমুদযো হোতি ।

৪। জিহ্বা পটিচ্চ রসেচ উপ্পজ্জতি জিহ্বা বিঞ্ঞাণং । তিন্ণং.....সমুদযো হোতি ।

৫। কায়ঞ্চ পটিচ্চা ফোট্ঠেব্বেচ উপ্পজ্জতি কায় বিঞ্ঞাণং । তিন্ণং.....সমুদযো হোতি ।

৬। মনঞ্চ পটিচ্চ ধম্মেচ উপ্পজ্জতি মনো বিঞ্ঞাণং । তিন্ণং সঙ্গতি ফস্সো । ফস্সপচ্চয়া বেদনা । বেদনা পচ্চয়া তন্হা । তন্হা পচ্চয়া উপাদানং । উপাদান পচ্চয়া ভবো । ভব পচ্চয়া জন্ম । জাতি পচ্চয়া জরা, মরণং, সোক, পরিদেব, দুক্খ, দোমনস্স উপায়াসা সম্ভবন্তি এব মে তস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্নস্স সমুদযো হোতি ।

চক্ষুন্দ্রিয়ের রূপ (বর্ণ) স্পর্শজনিত কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । তিনের সংস্পর্শের কারণে বেদনা । বেদনার কারণে তৃষ্ণা । তৃষ্ণার কারণে উপাদান । উপাদানের কারণে ভব । ভবের কারণে জাতি । জন্মের (জাতি) কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌমনস্য, উপায়াস সমূহ উৎপন্ন হয় এবং এভাবেই কেবল মাত্র দুঃখের কারণগুলি উৎপন্ন হয় ।

কর্ণন্দ্রিয়ের শব্দের স্পর্শ জনিত কারণে শোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । নাসিকা ইন্দ্রিয়ে গন্ধের সংস্পর্শে ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে স্বাদের সংস্পর্শে জিহ্বা বিজ্ঞান, কায়ন্দ্রিয়ে স্পর্শ জনিত কারণে কায় বিজ্ঞান এবং মনন্দ্রিয়ে ধর্মজনিত কারণে মনো বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ।

এরূপে চক্ষুবিজ্ঞান, শোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান এবং মনো বিজ্ঞান সমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে ।

যখন চক্ষু ও রূপের (দর্শনীয় বস্তু) প্রতিফলন সংঘর্ষ বা সম্মেলন ঘটে তখন চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে দর্শন প্রক্রিয়ায় কেবল মাত্র চক্ষু বিজ্ঞানই উৎপন্ন হয়েছে ওখানে স্ত্রী, সে, আমি বলে কিছুই নাই। কে দেখে? দেখারও কোন দর্শক বা ব্যক্তি নাই। আমি, তুমি, সে এরূপ কোন কর্মকর্তা চোখ বা দর্শনীয় বিষয়ে বা চক্ষু বিজ্ঞানে নেই। চক্ষু বিজ্ঞান চক্ষু বিজ্ঞানই। ইহাতে বেশ- কম কিছুই নেই। চক্ষু বিজ্ঞানকে আমি সে, তুমি গন্য করার কিছুই নেই।

চোখের সংযুক্তি, দৃষ্টিগোচর বস্তু এবং চক্ষু বিজ্ঞান এর কার্যক্রমে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। স্পর্শের কারণে বেদনা অনুভূত হয়। কিন্তু বেদনাতে স্ত্রী, পুরুষ, সে বা আমার কোন ব্যক্তি নেই।

বেদনার কারণে তৃষ্ণার উৎপত্তি এবং তৃষ্ণার কারণে উপাদান এবং উপাদানের কারণে কায় কর্ম, বাক্য কর্ম ও মনো কর্মের উৎপত্তি হয়। কর্মভব এর ফলশ্রুতিতে জন্ম বা জাতির উৎপত্তি। জন্ম যে অপায়ে হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

জন্ম নিলেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, সন্তাপ, দুঃখ , দৌর্মনস্য, মনস্তাপ এবং হতাশা। এভাবেই সমস্ত দুঃখ এর উৎপত্তি ঘটে।

শ্রবণের প্রত্যয়ে শব্দ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রবণ যোগ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুরূপ ভাবে শ্রাবণ প্রত্যয়ে, জিহ্বা প্রত্যয়ে, কায় প্রত্যয়ে ও মনো প্রত্যয়ে স্ব স্ব দ্বারে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উৎপত্তি ঘটে।

পূর্বকথিত স্কন্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ যা প্রয়াত মহাথের ছেয়াদ বিষদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বিষয়টি আরো বোধগম্য ও পরিষ্কার ভাবে জানার জন্য প্রচলিত গ্রাম্য ভাষার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

যখন কোন ব্যক্তি পছন্দনীয় কোন কিছু দেখে তখন তিনি তা কামনা করেন। অতঃপর দৃঢ় আসক্ত হন এবং তা পাবার জন্য স্বচেষ্ট হয়। উপমা স্বরূপ বলা যায় যখন সুন্দর কোন কিছু তার দৃষ্টি গোচর হয় তখন সে তা পাওয়ার আগ্রহ তীব্রতর হয়- ইহা তৃষ্ণা। কারণ ইহা তার নিজস্ব স্পৃহা- তার আসক্তি এতই তীব্র যে সে যেকোন ভাবে তা আয়ত্ত্বে আনতে বদ্ধ পরিকর- ইহাকেই উপাদান বলা হয়। আবার যখন ইম্পিত বিষয়ের জন্য কায়িক, বাচনিক, মানসিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করে তাকে কর্মভব বলে।

পাঠককে নকশার উল্লেখিত পালি আবৃত্তি করার জন্য উপদেশ দেওয়া হল।

কর্মভব প্রত্যয়ে জাতি-জন্ম কর্মভবের কারণে জাতির উৎপত্তি। জাতি প্রত্যয়ে জরা-মরণ, শোক, পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। জাতি বা জন্মের কারণে বার্ষিক্য, মৃত্যু, দুঃখ, অনুশোচনা, শোক, ব্যাথা, মনস্তাপ- এবং হতাশাগ্রস্ত হতে হয়। এভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের প্রবাহিত হয় অথবা অন্যভাবে বলা যায় ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের একক বিবর্তন প্রক্রিয়া যা আর কিছুই নয় কেবল স্কন্ধসমূহের প্রবর্তন প্রক্রিয়া মাত্র। এই স্কন্ধসমূহ আর কিছুই নয় জাগতিক নিয়মে দুঃখেরই সমষ্টি স্বভাব। অথবা বলা যায় দুঃখ সমষ্টির প্রবর্তন চক্র বা প্রবাহ।

বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকদের নিকট ইহাই প্রতীয়মান হবে যে, আমরা প্রতিষ্কণের মধ্যে কতবার বিরামহীন তৃষ্ণা, উপাদান, কর্মভব অথবা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বলা যায় আমরা দেখি, আমরা ইচ্ছা করি এবং আমরা ইম্পিত বস্তু পাওয়ার জন্য বিপুল প্রচেষ্টা চালাই এবং তীব্রতর ভাবে আসক্ত হই। এতে আমরা তিন ধরনের যথা- কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে সংস্কার গ্রস্ত হই। একই ভাবে আমরা যখন মনপুত কিছু

শুনি তখন আমরা উপভোগ করতে চাই। ইহাই তৃষ্ণা এবং আমরা যখন দৃঢ় ভাবে আসক্তিতে নিমজ্জিত হই- তাই উপাদান। আমরা ঈষ্পিত বস্ত্র পাওয়ার জন্য তিন ধরনের কাজে লিপ্ত হই, তাই কর্মভব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরূপ একই ত্রিধারে কর্ম প্রক্রিয়ায়, দ্রাণ, আশ্বাদন, স্পর্শ ও চিন্তনীয় বিষয়ের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায়।

সূর্য উদয় হতে সূর্যাস্ত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমায়ে না পড়ি ততক্ষণ স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমরা এই প্রক্রিয়ায় লিপ্ত থাকি।

পাঠক বর্গের মনোযোগ দেওয়া উচিত যে প্রকৃত প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব আর কিছুই নয় কেবল মাত্র তাকে নিজস্ব স্বভাব ধর্মের প্রক্রিয়া স্কন্ধসমূহের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখাল প্রতীত্যসমুৎপাদ হবে তাও কার্য্য-কারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বই অনুরূপ।

যদি তিনি মনে করেন ইহাই উপযুক্ত সময়। তার কার্য্য-কারণ প্রক্রিয়া রোধ করার। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে সংসার হতে বেড় হয়ে আসার পথ রয়েছে। যতই সে প্রার্থনা করুক পুনঃজন্মের প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র আদি-অন্তহীন ভাবে ঘূর্ণায়মান থাকবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দুঃখ, যন্ত্রণা, অনুতাপ, অনুশোচনা ইত্যাদিতে নিমজ্জিত থাকবেই।

যখন দৃশ্যমান বস্তুর সহিত চক্ষের স্পর্শ ঘটে তখন চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে বা চক্ষু বিজ্ঞানের প্রতি স্মৃতি দিন, ইহা কি এখনও রয়েছে? বিলয় হয়েছে? অথবা বিনাশ হয়ে গেছে? যদি স্মৃতি সহকারে নিরক্ষণ করে দেখা যাবে যে এই চক্ষু বিজ্ঞানের উদয়-বিলয় ঘটেছে। বিলুপ্ত বা অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। যোগীর নিকট স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে যে চক্ষু বিজ্ঞান বা দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না কারণ ইহার উৎপত্তি ক্ষণস্থায়ী। এই ভাবে যখনই চক্ষু বিজ্ঞান,

শ্রোত্র বিজ্ঞান, দ্রাঘ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান উৎপত্তির প্রতি ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান নেত্রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ইহা মনে রাখতে হবে যে যখন নিরক্ষণ চেতনা উৎপন্ন হবে তখন চক্ষু বিজ্ঞান বা অন্য যেকোন চেতনা বা বিজ্ঞান বিলুপ্ত বা বিনাশ হয়ে যাবে। কেননা একসাথে দুটি চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না। একের পর এক উৎপন্ন হয়।

চিত্ত এখন উৎপত্তি হয় এখনই নিরুদ্ধ হয়। ইহার অর্থ এই কেবল মাত্র এক মুহূর্তে একটি চিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং যোগীদেরকে নিরক্ষণ করার জন্য উপদেশ দেওয়া যাবে যে গভীর ভাবে চিন্তা করুন যে স্কন্ধই উৎপন্ন হউক না কেন- নাম-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান একসাথে স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি ক্ষণস্থায়ী। কারণ উদয় হয়- বিলয় হয় এবং বিনাশ হয়ে যায়। ইহাই প্রকৃতপক্ষে যোগীদের স্কন্ধসমূহ কেবল অনুভব করা যায়। প্রত্যেক উৎপত্তি ক্ষণিকের জন্য। পুরাতন স্কন্ধসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ঘটায়। এভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দুঃখময় পুনঃ জন্মের সংসার চক্র ঘূর্ণায়মান।

যদি কোন যোগী ভুল পর্যবেক্ষণ করে অথবা চক্ষু বিজ্ঞানের প্রতি গভীর ভাবে স্মৃতি না দেন তবে তাতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হতে পারে এবং তৃষ্ণাকে যদি ভুল পর্যবেক্ষণ বা গভীর স্মৃতি না করেন তবে অবশ্যই উপাদানের উৎপত্তি হবে। তাকে অবশ্যই গভীর স্মৃতির সহিত আসক্তিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি ব্যর্থ হয় কর্মভবের উৎপত্তি হবে। কর্মভবের কারণে অবশ্যই জাতি, জাতির কারণে মরণের আওতাভুক্ত হতে হবে। কাজেই ঘূর্ণায়মান প্রতীত্যসমুৎপাদ পুনঃরায় উপস্থিত।

মূল পালি হিসাবে এখানে আর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। কর্ণকে ভিত্তি করে শব্দ উৎপন্ন হলে শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং তিন এর সমন্বয়ে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা হয়।

যদি কোন ব্যক্তি তার ছোট ছেলে স্কুল থেকে ফিরে আসার পর ছেলের গলার আওয়াজ শুনে সাথে সাথেই ছেলেকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে এবং ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খাবে। তিনি এসবকিছু করলেন কেবল আসক্তির কারণে। তিনি হয়ত চিন্তা করে বলবেন যে সব কিছুর কারন হল এটি তাঁর ছেলে এবং তিনি তাকে ভালবাসেন। তাতে কোন দোষ নেই পাপ নেই কারণ তিনি কোন নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করেননি। প্রকৃত সত্য হল এই যে প্রতীত্য সমুৎপাদের অলংঘনীয় প্রক্রিয়া আদি-অন্তহীন ভাবে ঘূর্ণায়মান।

প্রতীত্য সমুৎপাদ কি ভাবে প্রবর্তীত হয় তা বিচার বিশ্লেষন করার জন্য পুনঃরায় স্কুল ফেরত ছেলের কণ্ঠস্বর নিরক্ষণ করা যাক। ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনার সাথে সাথে তাকে দেখা, সোহাগ ও জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা বা তৃষ্ণা জাগে। অতিরিক্ত বাসনার কারণে জড়িয়ে ধরে। সোহাগ করার জন্য অভিভূত হয়ে পড়ে। এই বাৎসল্যই কর্মভব। কর্মভবের কারণে জাতি। কর্মভবের কারণেই জন্ম অবধারিত। নকশাতে উল্লেখিত তিন নং অংশের সহিত চার নং অংশ সংযোগ প্রক্রিয়া প্রতীয়মান হবে।

ভবগামিকং কন্মংবলং সৰ্ব্বেণ্ড বুদ্ধ্যপি পটিবহিভুং সঙ্কোন্তি।

অর্থাৎ ভবের উৎপত্তি কর্ম- কর্মের শক্তি সমূহকে প্রতিহত করা সর্বজ্ঞ বুদ্ধের পক্ষেও সম্ভবপর নহে।

সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অচিরে চলতেই থাকে। যখন কোন আকর্ষনীয় বস্তু বা বিষয় পরিলক্ষিত হয় তাতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে কর্মভব এর উৎপত্তি এবং এই ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদের সুনিয়ন্ত্রিত চক্র ক্ষান্তহীন ভাবে ঘূর্ণিয়মান।

যখন সুমধুর সুর শুনায় তাতে শুনার তৃষ্ণা জাগে। তৃষ্ণার কারণে উপাদান, কর্মভব, জাতি, জরা-মরণ এবং এভাবেই সমস্ত



সুনিয়ন্ত্রিত নির্দয়-নিষ্ঠুর প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র অবিরাম ঘূর্ণিয়মান। অনুরূপ ভাবে কোন সুগন্ধীয়ুক্ত খাদ্যের দ্বাণে আনন্দপ্রসাদে প্রতিভাত হয় তখন আশ্বাদনের অভিপ্রায় জাগে। এই সুগন্ধীয়ুক্ত আহারের স্পৃহার কারণে অনুক্রমিক ভাবে তৃষ্ণা, উপাদান, কর্মভব, জন্ম, জরা-মরণ, শোক, পরিদেবন, উপায়াস, দুঃখ-দৌর্মনস্য এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্টের উৎপত্তি ও ভোগ করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে, যখন মনোরম বিষয়বস্তু, সুমধুর শব্দ, মনোরম সুগন্ধী, লোভনীয়, স্বাধ সুখময় স্পর্শ, আনন্দময় পরিকল্পনা ষড়ায়তন বা ছয়দ্বারে প্রবেশ করে সেখানে অবশ্যই তৃষ্ণা এবং অন্যান্য সব আয়তনসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রবর্তিত হয়। এই অনুচক্রিক প্রক্রিয়া আর কিছুই নয় কেবল ক্লেশ বর্ত যার পরিণতিতে কর্মবর্ত উৎপত্তি। আবার কর্মবর্তার কারণে বিপাক বর্ত প্রবাহিত হয়। এভাবে ক্লেশ বর্ত, কর্মবর্ত ও বিপাক বর্ত অবিরত ঘুরতে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে নকশাতে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান ক্লেশ বর্তের অন্তর্গত অন্যদিকে সংস্কার এবং কর্মভব কর্মবর্ত হতে উৎপন্ন এবং বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জন্ম, জরা-মরণ, বিপাক বর্তকে সংগঠিত করে।

অনুরূপভাবে দ্বাণ হেতু, জিহ্বা হেতু কায় হেতু এবং মনের প্রত্যয়ে..... স্বল্প প্রতীত্যসমুৎপাদ ধরে নেওয়া যেতে পারে যা বিদর্শন ভাবনায় স্মৃতি অনুশীলনে মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সমস্ত সংসার চক্রের প্রবাহ প্রক্রিয়া বিরামহীন ভাবে চলমান থাকবে যার দ্বারা সমস্ত দুঃখ-কষ্টে পুনঃরায় আবর্তিত হতে হবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

কিভাবে বেদনা থেকে প্রতীত্যসমুৎপাদ

চক্র চক্রাকারে ঘূর্ণয়ন আরম্ভ করে?

নকশার দ্বিতীয় অংশে দৃষ্টিপাত প্রদান করলে দেখা যাবে যে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ বেদনা ওখানে রয়েছে।

যখন ইন্দ্রিয় দরজায় আলম্বনের সমন্বয় সাধিত হয় তখন স্পর্শের উৎপত্তিতে বেদনার উন্মেষ ঘটায়। সে বেদনা সুখ, দুঃখ অথবা না সুখ-না দুঃখ বেদনা হতে পারে।

ইহার ব্যাখ্যার জন্য ধরা যাক এক ব্যক্তি একটি অতি সুন্দর ফুল দেখল এবং সে ফুলটির প্রতি যদি, আকৃষ্ট হয়ে থাকে তবে সে সুখ বেদনা অনুভব করবে। সে যদি ফুলটি পেতে ইচ্ছুক হয় তবে সেখানে অবশ্যই উপাদানের পশ্চাতে ধাবিত হতে হবে। এভাবেই প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খল ঘুরা আরম্ভ করে।

ইহা মনে রাখতে হবে যে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র যখন তখন থেমে যায় না। যখন উপাদান কর্মভাবে ধাবিত হবে তখন অবশ্যই পুনঃজন্ম বা জাতি উৎপত্তি হবে। নকশার তৃতীয় এবং চতুর্থ বিভাগে কর্মভব ও জাতির সংযোগে প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান।

এখানে সংযোগ অর্থ হল প্রতীত্যসমুৎপাদের নিজস্ব ক্রিয়া পদ্ধতি।

বুদ্ধ বলেছেন, যেখানে বেদনার পরে তৃষ্ণা বিদ্যমান সেখানে আমি কখনো বলব না যে মার্গ, ফল বা নির্বাণ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সেইরূপ যেখানে বেদনার পরে দ্বেষ ও দৌর্মনস্য পশ্চাদ্বর্তী হবে মার্গ, ফল বা নির্বাণ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

যখন ইহা বলা হয় যে ক্ষান্তহীন প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রক্রিয়া প্রচলিত অর্থাৎ ইহা ইঙ্গিত করে যে ইহা প্রকৃতি স্বভাবেরই স্বক্ক । যা ক্ষান্তহীন সংসার চক্রের শৃঙ্খলের অধীনস্থ । এখানে স্বক্ক অর্থ শরীর নয় যার ওজন ৭০ কেজি বা ১০০ কেজি । ইহা যাকে বলে প্রচলিত প্রথা মাত্র ।

স্বক্ক অর্থ কি? যখন কোন বিষয়বস্তু বা আলম্বন ইন্দ্রিয় দ্বারে অনুপ্রবেশ করে সেক্ষেত্রে বেদনা বা অনুভূতির উৎপন্ন হয় । অন্য অর্থে বেদনা স্বক্কের উদ্ভব হয় । স্পর্শ যেখানে-সেখানেই বেদনা যা বেদনাস্বক্কের অন্তর্গত । যেখানেই স্পর্শ সেখানে সঞ্ঞা বা সংজ্ঞার উৎপত্তি যা সংজ্ঞাস্বক্ক নামে পরিচিত । চেতনার প্রক্রিয়াকে সংস্কারস্বক্ক এবং বিজ্ঞান স্বক্ক কায় বা রূপকে রূপস্বক্ক । যে কোন স্বক্কই হউক না কেন সবগুলিই শৃঙ্খল সদৃশ স্বক্করই প্রক্রিয়া । পরোক্ষ ভাবে বলা যায় এসবকিছু প্রকৃতই প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত । যা ত্রিপিটক গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু দেহে (স্বক্কে) বিদ্যমান । প্রতীত্যসমুৎপাদ যেখানে চলমান অথবা স্বক্কের বীথি কার্যক্রম সেখানে আর কিছুই নেই কেবল মাত্র দুঃখ স্বক্ক সমূহই বিরাজমান । নিদানবর্গ সূত্রে বলেছেন যদি কেউ প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বারা প্রলোভিত হয়ে জীবন যাপন করে তবে তাকে মিথ্যা পতিপাদ মার্গ বলা হয়েছে । যিনি বিদর্শন স্মৃতি অনুশীলন করে তাঁকে সম্যক পতিপদ মার্গ বলা হয়ে থাকে ।

সুতরাং নিশ্চিত করে বলা যায় যে যিনি মার্গ ও ব্রহ্মচর্য্যা অনুশীলন করেন বা বিদর্শন দ্বারা স্বক্ক উৎপত্তি করন থেকে পৃথক হতে চান, বা কর্ম শক্তি বা স্বক্ককে ছেদন করতে ইচ্ছুক তাঁকে বলা যায় তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ এর শৃঙ্খল মুক্ত হতে স্বচেষ্ট । চিত্র অনুসারে বিদর্শন অনুশীলন হল তৃতীয় অংশের সহিত চতুর্থ অংশের ছেদন প্রচেষ্টা পক্ষান্তরে বলা যায় তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে কর্ম শক্তিকে উত্থানের সুযোগ না দেওয়া ।

আরো বলা যেতে পারে যে বিদর্শন এমন একটি কাজ বেদনা পচ্যো তন্থা না হয়ে বেদনা প্রত্যয়ে স্মৃতি চর্চা জ্ঞানে পরিণত করা যায়। ইহা এমন একটি কাজ যা তৃষ্ণাকে বেদনার পর বিদর্শন মার্গে (বিদর্শন মার্গ অর্থ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি) পুনঃ স্থাপন করতে পারে।

বিদর্শন মার্গ বা বিদর্শন অনুশীলন ছাড়া নিশ্চিতভাবে বলা যায় তৃষ্ণা অবশ্যই সংসারের পশ্চাতে ধাবিত হবে। এমন কোন শক্তি নেই তৃষ্ণা উৎপত্তিকে রোধ করতে পারে। যদি কেউ প্রতীত্যসমুৎপাদের পশ্চাত ধাবিত হয় তাকে অবশ্যই সমুদয় ও দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে। সমুদয় ও দুঃখ তার নিত্য সঙ্গী; একটি বৃক্ষমূল বা খুঁটি সদৃশ। এটি পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হলেও সে বৃক্ষ মূলের মত অপরিবর্তীত থেকে যাবে।

পাঠক বর্গের কি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়েছে? আপনারা কি মার্গ ফলের পথ বেছে নেবেন না সংসারের খুটির মত অপরিবর্তীত থাকবেন? দুঃখপূর্ণ সংসার চক্র হতে রেহাই পেতে হলে তাকে মার্গের পথ অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ বিদর্শন স্মৃতি অনুশীলন দ্বারা পঞ্চ মার্গ (পূর্ব ভাগ মার্গ) প্রয়োগের মাধ্যমে উদয়-ব্যয় এর গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

উল্লেখ করা উচিত সাধারণ যে ভাবে চিন্তা করা হয় বেদনাকে এখানে অনুসন্ধান করতে হবে না। যেখানে স্পর্শের তীব্র ভাব রয়েছে সেখানে বেদনার উৎপত্তিকে খোঁজার প্রয়োজন নেই। কোন না কোন বেদনা যেমন সুখ বা দুঃখ মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ সদৃশ বা অসদৃশ সব সময় আমাদের নিকট থাকবেই। যেহেতু সর্বদা ষড়ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দ্বারে বেদনা উদয় হয় সেহেতু বেদনাকে পর্যবেক্ষণ করে অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

বেদনা আমাদের নিকট উদয় বিলয়ের মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে থাকে। যোগীকে স্মৃতির মাধ্যমে দেখতে হবে যে- বেদনা

অনিত্য, উৎপন্ন হচ্ছে আর বিলয় হচ্ছে। যোগী যদি বেদনাকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে বলা যাবে তিনি নিত্য সঞ্ছা আওতার বাহিরে (বর্তমান ভুল দৃষ্টির বাইরে)। তিনি সঠিক পথে থেকে ভাবনাময় জ্ঞান দিয়ে বেদনার অনিত্যতাকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ত্রিলক্ষণ জ্ঞান পরিপক্বতায় এভাবে বেদনা নিরোধ তৃষ্ণা নিরোধ অর্থাৎ যখন বেদনা সম্পূর্ণ ভাবে বিলয় হবে তৃষ্ণাও সম্পূর্ণ ভাবে বিলয় হবে। তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিরোধই নির্বাণ।

-----o-----

## পঞ্চম অধ্যায়

### প্রতীত্যসমুৎপাদ বিচরণ প্রক্রিয়া

বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের অভাবে যোগী নাম-রূপ তথা চক্ষাদি ইন্দ্রিয় দ্বারে চিত্তের (চক্ষু বিজ্ঞান) উদয়-বিলয় প্রতিক্রিয়াকে স্মৃতি সহকারে যথাযথ ভাবে নিরীক্ষন করতে সক্ষম হন না। অনুরূপ ভাবে শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান ও মনো বিজ্ঞান এর অবিদ্যাজনিত কার্য্য কারণ নীতির প্রতীত্য সমুৎপাদ শৃঙ্খলের বিচরণ শুরু হয়। অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বার আচ্ছাদিত হয়ে সমস্ত রকম সংস্কার (কায় সংস্কার, বাক্য সংস্কার এবং চিত্ত সংস্কার) উৎপন্ন হয়। যথা- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নাম-রূপ। অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধেরই উৎপত্তি বুঝায়। পঞ্চস্কন্ধ থাকলেই স্পর্শ বিদ্যমান থাকে। স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণার কারণে উপাদানের উৎপত্তি হয়। উপাদানের কারণে ভব এবং ভবের কারণে জন্ম। জন্মের হেতুতে সকল প্রকার দুঃখ, এবং বিরামহীন প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খল আবার অনব্রত ঘূর্ণায়মান হবে।

সুতরাং যোগী যখন অন্য আলম্বনে রমিত থাকে বা কালক্ষেপন করে বা গভীরভাবে স্মৃতি অনুশীলনে ব্যর্থ হয় অথবা উদয় বিলয় স্মৃতি অনুশীলনের অভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদ শৃঙ্খল বা অবিদ্যার কার্যক্রম পুনরায় আরম্ভ হয় ইহা মিথ্যা প্রতিপদা। আটটি অঙ্গ- বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্মভব ইত্যাদি অবিদ্যা শৃঙ্খল আবদ্ধ থাকে। চক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যখন এ সমস্ত আটটি অঙ্গকে সম্যক দৃষ্টিতে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে দর্শন করলে ইহা সমুদয় এবং দুঃখ সত্য রূপে পরিগণিত হয়। সমুদয় হল আগুন এবং স্কন্ধ হল জ্বালানি। আগুন ও জ্বালানি সহজাত। ইহারা অবিচ্ছিন্ন। যেখানে আগুন সেখানে জ্বালানি, যেখানে জ্বালানি সেখানে আগুন। সুতরাং সংসার হল আগুন ও জ্বালানির সংযোগ পরস্পর আবদ্ধ। যখন আগুনের দাহিকা শক্তি কমে আসে তখন পুনরায় জ্বালানি সংযোজিত হয়। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সংসার (সমুদয় ও স্কন্ধ দুঃখ) এর সমষ্টি। কিন্তু এই সংসার আগুন নেভানোর জন্য সামান্যতম ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা কারো নেই। আগুনই তার প্রমান।

বর্তমান অবস্থানে যাদের উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধা এবং কিছু দূরদর্শী জ্ঞান সম্পন্ন তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাঁরা আগুন নেভানোর জন্য জ্বালানি প্রত্যাহার করবেন কি না?

-----o-----

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়

শেষ প্রাপ্ত হতে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রের ঘূর্ণিয়মান প্রক্রিয়া  
(প্রতিলোম ভাবে কার্য্য কারণ নীতির গতি বিধি)

“সোক পরিদেব দুক্খা দোমনস্স উপায়াস সম্ভবন্তি  
এবমেতস্স কেবলস্স দুক্খখক্কস্স সমুদয় হোতি।”

দ্বেষ দৌর্মনস্য এর প্রতিক্রিয়া অনিষ্টকারী দেখার সাথে সাথে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাদের সহিত মুখামুখি হতে বা কথা বলতে ক্রোধ ভাব জাগে। তাদের আওয়াজ বা দৃশ্য ঘৃণ্য ও বিদ্বেষপূর্ণ। পালি গ্রন্থে বলে- দ্বেষ, শোক, পরিদেব, দৌর্মনস্য, উপায়াস, সমভাব এমন কি মিত্রতাও কেবল মাত্র দুঃখস্কন্ধ সমুদয় হয়। ইহার অর্থ সমস্ত দুঃখ কষ্ট উৎপন্ন হলেই পালি গ্রন্থ মতে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র প্রতিলোম ভাবে ঘূর্ণিয়মান হয়। আসব সমুদয় অবিদ্যা সমুদয়, কারণ বিদ্বেষ এর কারণে অজ্ঞানতার উৎপত্তি।

সুতরাং অমনোজ্ঞ ও অবাস্তুর কিছু দেখার পর যোগী যদি গভীর ভাবে স্মৃতিমগ্ন হতে না পারে (অর্থাৎ উদয়-বিলয়) তবে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র শেষ প্রান্ত থেকে প্রতিলোম ভাবে বিবর্তন শুরু করে।

-----o-----

## সপ্তম অধ্যায়

বিদর্শন স্মৃতি অনুশীলনের অভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ

সংসার চক্রের কার্যক্রমে সর্বদা সক্রিয় থাকে

প্রতীত্যসমুৎপাদ সর্বদা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। কেবল মাত্র ঘুম (যখন ভবাস্তে পতীত হয়) এর সময় প্রত্যেককে ইষ্ট আলম্বন এবং অনিষ্ট আলম্বনের সম্মুখীন হতে হয়। কখনো কখনো বিষয় গুলি দ্বৈষগ্রস্ত, লোভগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে।

যখন প্রতীত্যসমুৎপাদ লোভ, দ্বেষ ও মোহ নিয়ে আবর্তিত হয় তখন অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হয় এবং সে অপুণ্য সংস্কারে নিমগ্ন থাকে। যখন কোন ব্যক্তি আনন্দঘন পরিবেশে পরিবেষ্টিত থাকে যথা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজন বা ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে তখন প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রে লোভ চিন্তা আবর্তিত হয়। কখনো

কখনো সে যদি অবাধ্য পুত্র কন্যার অন্যায় আচরণ বা ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তখন প্রতীত্য-সমুৎপাদ চক্রে দ্বেষ চিত্ত আবর্তিত হয়।

যখন অন্যমনস্ক ভাবে বা না জেনে ভুল কাজ সম্পাদন করে তবে তাকে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব মতে মোহ চিত্তের আবর্তন বলা হয়ে থাকে।

কুশল সংস্কার অথবা পুণ্য সংস্কার। যখন কোন ব্যক্তি পরবর্তী জন্মে উচ্চস্তরে জন্ম গ্রহণ করার জন্য গুণসম্পন্ন কুশল কাজ করে (যে কাজের ফলে পুনঃরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করতে হয়) তাকে বৃত্ত কুশল বলা হয়। দুঃখ সত্য বা কোন কিছু লাভ করার আশায় কোন গুণসম্পন্ন কাজ সম্পাদন করে তাকে পুণ্য সংস্কার বলে।

অবিজ্ঞা ভিক্ষবে অবিজ্ঞাগতে পুঞ্ঞাভিসঙ্খরম্পি, অভিসঙ্খরোতি!! অপুঞ্ঞাভি সঙ্খরম্পি অভিসঙ্খরেতি। অনোভি সঙ্খরম্পি অভিসঙ্খরা হোতি। যতো চ খো ভিক্ষবে ভিক্ষুনো অবিজ্ঞা পহীনা। বিজ্ঞা উপ্পন্না। সো অবিজ্ঞা বিরাগা বিজ্জুপ্পাদা নেব পুঞ্ঞাভি সঙ্খারন অভিসঙ্খরতি। (সংযুক্ত নিকায়)

হে ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাহীন মোহগ্রস্ত ব্যক্তি পুণ্য অভিসংস্কার করে এবং অপুণ্য অভিসংস্কারও করে। রূপ ধ্যানস্তর, অরূপ ধ্যানস্তর লাভে অভিসংস্কারও সম্পাদন করে। যদি অবিদ্যাকে সমূলে প্রহান করে বিদ্যারূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন ভিক্ষু সর্ব সংস্কার থেকে বিরত থাকে।

সূতরাং উপরোক্ত বিবরণ মোতাবেক যিনি অবিদ্যা শূন্য বা অবিদ্যাহীন, অবিদ্যা মুক্ত এবং অবিদ্যা পরিত্যক্ত তিনি নির্গাত অরহত বটে। এরূপ অরহতগণের করণীয় কিছুই নেই এবং পুণ্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় না। যদি গুণযুক্ত ক্রিয়া করেও থাকেন



তবে তা কেবল মাত্র উদ্দেশ্যবিহীন, (ক্রিয়া চিত্ত) কোন ফলের আশাও করেন না।

স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী আগের চেয়ে বেশী বেশী দান ও শীল পালন করা দরকার যাতে পৃথকজনেরা তাঁদেরকে অনুসরণ করে দান ও শীল পালনে উৎসাহিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে দান এবং তৃষ্ণা কোন কারণেই যে মিশ্রিত না হয়। দান দৃষ্টি কোন কারণেই সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয় এবং দান শীল যে কোন ভাবেই অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় দান কুশল না অকুশল? উত্তর হবে দান অবশ্য কুশল। তৃষ্ণা ক্ষয় করার জন্য দান তা সন্দেহাতীত ভাবে কুশল কর্ম। কিন্তু পরবর্তী জন্মে উচ্চস্তরে জন্ম নেওয়ার জন্য যে দান তা তৃষ্ণায়ুক্ত, সুতরাং তা নির্বাণের সহায়ক নয়। ইহা কিন্তু কুশল ও অকুশল কর্মের সংমিশ্রণ। উপমা স্বরূপ, যদি আমি পরবর্তী জন্মে ফল ভোগ করার জন্য দান দিয়ে থাকি তবে আমার ক্রিয়া কাণ্ড দৃষ্টিদ্বারা আধিপত্য এবং প্রভাবিত হয়েছে যা অকুশলই বটে। তৃষ্ণা ও দৃষ্টির ব্যাপারে হতবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অবিদ্যাকে আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়ে কোন দান করা উচিত নয়। দান দেওয়ার সময় যদি কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির অভাব হয় যদি দানের ফল সম্পর্কে সঠিক ভাবে নিরূপন করতে না পারে তবে তা বর্ত দান অথবা পুণ্য সংস্কার বলে গণ্য হবে এবং ইহার পরিণাম ফল কিন্তু সংসার চক্রেরই প্রক্রিয়া বিশেষ।

সুতরাং স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি যে দান দিচ্ছি তা সংসারবর্ত বুদ্ধির জন্য নয়। সঠিক বোধগম্যতার অভাবে। সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান ব্যতীত দান দিলে তা বিবর্ত দানে পরিণত হবে।

## অষ্টম অধ্যায়

### অনুলোম ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ

#### স্বভাব ধর্মের বিশদ ব্যাখ্যা

প্রতীত্য সমুৎপাদ চিত্র চক্র অনুক্রমে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে পঞ্চস্কন্ধ মোতাবেক ইহা প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ কর্তৃক চিত্র অংকন প্রকারভেদ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। প্রমাণিত হয় যে প্রতীত্য সমুৎপাদ স্কন্ধসমূহের বিরামহীন প্রক্রিয়া অর্থাৎ পুরাতনের বিনাশ স্থলে নতুনের উৎপত্তি। অন্যভাবে বলা যায় প্রতীত্যসমুৎপাদ হল কার্য্যকারণ প্রক্রিয়া অনুসারে নাম-রূপের উদয়-বিলয় প্রবাহ।

“অনমতল্লো যং ভিক্ষবে সংসারো পুস্ককোটি ন পঞ্ঞাতি  
অবিজ্জা নীবরনানং সত্ত্বানং তন্থা সংযোজনানং সন্ধাবতং  
সংসরিতং।” (অনমতগো সূত্র, সংযুক্ত নিকায়)

সংসার এতই দীর্ঘ যে সত্ত্বগণের আদি উৎপত্তি আমি খুঁজে পাইনি। বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে পরিনির্বাণ পর্যন্ত খুঁজলেও সত্ত্বগণের আদি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখি না। কারণ সংসারের প্রারম্ভ এতই দীর্ঘ।

এক এক জনের এক একটি হাড় জমা করে স্তূপ করা হলে তা বৈপুল্য পর্বত সমান উঁচু হত যার চূড়ায় উঠতে কমপক্ষে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় সংসার কতই দীর্ঘ। সংসার ভ্রমণ যেরূপ দীর্ঘ দুঃখ কষ্ট ভোগও তত দীর্ঘ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রও অনুরূপ দীর্ঘ বটে।

বলা যায় যে অবিদ্যাই সংসারের প্রারম্ভ, তাহলে প্রশ্ন উঠে অবিদ্যা কাকে বলে?

১। দুঃখের কারণকে দুঃখের কারণ বলে সম্যক রূপে না জানা অবিদ্যা।

২। দুঃখ সত্যকে দুঃখ সত্য বলে সম্যক রূপে না জানা অবিদ্যা।

৩। নিরোধ সত্যকে নিরোধ সত্য রূপে সম্যক রূপে না জানা অবিদ্যা।

৪। মার্গ সত্যকে মার্গ সত্যরূপে সম্যক রূপে না জানা অবিদ্যা।

উপরোক্ত বর্ণনা গুলির বিষদ ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল-

১। আমাদের জীবনে ভোগরূপ কর্ম সম্পাদনের জন্য অর্থ বিত্ত, বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, সম্মানজনক পদে উচ্চাভিলাষী হতে জীবন যাপনের জন্য লোভ গ্রস্ত হই। এই লোভই দুঃখের কারণ। দুঃখের কারণকে দুঃখের কারণ রূপে না বুঝাটা অবিদ্যা।

২। আমাদের পঞ্চস্কন্ধ সমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দুঃখ সত্যরূপে না জানাটাই অবিদ্যা।

৩। দুঃখ নিরোধ নির্বাণ না জানাটাই অবিদ্যা।

৪। অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ দর্শনে সম্যক অনুশীলন নীতি নিয়ম না জানাটাই অবিদ্যা।

এসব অজ্ঞানতাই অবিদ্যা এবং সমস্ত কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়া কাণ্ড অজ্ঞানতার কারণেই উৎপত্তি। সেজন্য বুদ্ধ বলেছেন অবিদ্যা পচয় সংস্কার না জানাটাই দুঃখ-সত্যের মূল কারণ। দুঃখের মূল কারণকে সঠিক ভাবে বুঝতে না পেরে নিজের এবং পরিবারে স্বার্থে সম্পদ অর্জন বা উন্নত জীবন যাপনের জন্য নানা কৌশল, ফন্দি ও বিবেচনাহীন কুশল, অকুশল ক্রিয়া কাণ্ডে লিপ্ত হয়ে থাকে।

তিনি হয়ত বলতে পারেন যে ন্যায় সঙ্গত ব্যবসা বাণিজ্যই তিনি করে থাকেন, কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদের অলঙ্ঘনীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যায় যে সে সংসার শৃঙ্খল ছিন্ন করার কাজে লিপ্ত

নয়। বরং তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদের সহিত পুনঃ সংযুক্তি জনক কাজে নিয়োজিত। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি অপরাধ করেছেন? উত্তর হল তিনি কোন অপরাধ করেছেন কিনা তা বলা যাবে না তবে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা যাবে যে তিনি চক্রাকারে ঘূর্ণিয়মান প্রতীত্যসমুৎপাদ শৃঙ্খলের সহিত সম্পর্ক যুক্ত।

আবার দেখা যায় পরবর্তী জন্মে উন্নত অবস্থানের জন্য দান কার্য সম্পাদন করে থাকেন। সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় ইহা কুশল কর্ম, তবে অবিদ্যার সহিত যে কোন কুশল কাজ করা হউক না কেন তা যদি দুঃখ সত্যকে প্রকৃত ভাবে না জেনে করা হয় তবে তা পুন্য সংস্কারের অন্তর্গত হবে। কারণ অবিদ্যা প্রত্যয়ে কুশল সংস্কার। পরবর্তী জীবনে দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে দান দেওয়া ও শীল পালন করা হয়। ইহাও অবিদ্যা প্রত্যয়ে কুশল সংস্কার। বন্দনাদি করার পর সাধারণত সবাই প্রার্থনা করে থাকেন। “আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।” যদিও বা তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে দেব ও ব্রহ্ম হয়েও থাকেন। তবে পরবর্তী অবস্থানে গুরু কিন্তু জাতি বা পুনঃ জন্মদিয়েই। জন্ম দুঃখ সত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে উল্লেখ করেছেন। “জাতিপি দুক্খ সচ্চ।”

সজ্জার পচয় বিঞ্ঞানং সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কার কুশল বা অকুশলই যাই হোক তাতে পুনঃ জন্মের বীজ বা চেতনা উৎপন্ন হবেই। যে অবস্থানই হোক না কেন তাকে দুঃখের করালগ্রস্ত হতেই হবে। খাঁটি ও সহজ কথায় বলা যায় আমরা অবিদ্যাকে সুখ মনে করে প্রতারিত ও প্রভাবিত হয়ে কুশল-অকুশল সংস্কার কার্য্য করে থাকি। সুতরাং যোগীদের এ মুহূর্তে বিবেচনা করা উচিত কোন দান বা পূণ্য কর্ম সম্পাদন করার সময় পরবর্তী জন্মে সুদীর্ঘ উন্নত জন্ম লাভ করার ইচ্ছা মনে পোষন করবেন কি না? যোগীদের জন্য সবচেয়ে উন্নত

পরামর্শ হল দেব লোক ব্রহ্মলোক বা যে কোন লোকে পুনঃ জন্ম রোধ করা। কারণ যেকোন লোকে উৎপত্তি দুঃখ জনক।

“বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নাম-রূপ।” যে জন্ম ধারণ করবে সে অবশ্যই নাম-রূপ অধিকারী হবে। এক্ষেত্রে চিত্রের তৃতীয় বিভাগ উল্লেখ করা যেতে পারে। নিরক্ষণ করা উচিত যে বিজ্ঞানকে যদি আমি, আমার বা অহং থেকে থাকে তবে নাম-রূপেও অবশ্যই তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা উচিত। আমি, আমার অহং অথবা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত কারণ বিদ্যমান আছে কিনা?

বিজ্ঞান হল প্রতীক্ষা বিজ্ঞান যা বর্তমান অবস্থানের প্রারম্ভ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে আমি, স্বয়ং সে তোমার মধ্যে কোন স্বতন্ত্রবোধের কোন হেতু নেই কেবল মাত্র সংস্কারের পরিণতি বা ফলাফল।

নাম-রূপকেও যদি সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে তন্ন তন্ন করে নিরক্ষণ করলে দেখা যাবে আমি, অহং, তুমি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বতন্ত্রবোধের কোন কারণ নেই। আমি বা আমার কোন মালিক নেই। ইহা কেবল মাত্র সংস্পর্সিত নৈমত্তিক ধারাবাহিকতার ফলাফল বা প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র।

নাম-রূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন। যেখানে নাম-রূপ আছে সেখানে বিষয় বস্তুগুলির সাথে সাথে বিলুপ্ত হয় না। নাম-রূপ বিদ্যমান থাকার কারণে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনের উৎপত্তি বা বিকাশ ঘটে থাকে।

চক্ষু হল দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তুর ইন্দ্রিয় গোচর দৃশ্য যার ভিতরে অহং, আমি, আমার বলতে কিছু নেই। ইহাও আমি নহি, আমার চোখ নহে, আমার আত্ম বলে দাবি করার কি আছে?

নাসিকা হল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বিপরিনাম সংস্পর্সিত পরিণতি বা ফলাফল যাতে এমন কোন হেতু আমি, আমার, আত্মা বা স্বতন্ত্রবোধ দাবী করার কিছুই নেই।

জিহ্বা, কায় এবং মন এর ব্যাপারেও অনুরূপ ধারণা পোষন করতে হবে।

এসমস্ত সংস্কারের (ষড়ায়তন) উপর নির্ভর করে সংসার বিস্তারের সুযোগ উৎপন্ন হয় অথবা অন্য ভাবে বলা যায় ইহারা ই সংসার শৃঙ্খলিত প্রতীত্য সমুৎপাদের চক্রকে দীর্ঘায়িত করে থাকে।

চক্ষু যেমন সংসার বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় সেরূপ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, মন ও সংসার বৃদ্ধি করে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিবরণ মতে নিজকে নিজে পরীক্ষা করে নিজের সার্থে দেখুন রূপ, শব্দ, রস, স্পর্শ, মন সংস্কার (চিন্তন ক্রিয়া) কার্যক্রম বন্ধ করবেন কি না? যদি আপনি মনোজ্ঞ কোন দৃশ্য শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, মনোময় চিন্তন বিষয় হতে নিবৃত না হন, যদি বিষয় সমূহ পছন্দ করে; তা পাবার জন্যে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তবে তাতে সংসার চক্রের সঙ্গে সংযোজন হয়ে বা প্রতীত্যসমুৎপাদে সম্প্রসারিত বা সংসার দুঃখের পরিধি প্রশস্ত হবে। অনুরূপ ভাবে অবশিষ্ট পাঁচটি ষড়ায়তন সম্পর্কেও একই নিয়মে বুঝে নিতে হবে।

স্পর্শের কারণে বেদনা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সংস্পর্শে আসার প্রক্রিয়া হলেই অনুভূতি উৎপন্ন হয়। চক্ষু সংস্পর্শের কারণ বশতঃ চোখের উপর নির্ভর করে বেদনার উৎপত্তি। পালি ভাষায় ইহাকে চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, অনুরূপ ভাবে অন্যান্য অনুভূতির উপর নির্ভর করে অন্যান্য চেতনা সমূহ যথা ক্রমে শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রান সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায় সংস্পর্শজ বেদনা এবং মনো সংস্পর্শজ বেদনা বলা হয়ে থাকে। আবার বেদনা সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা এরূপ তিন ভাগে বিভক্ত। অথবা ইহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য ও উপেক্ষা বেদনা অথবা ইহাকে

আরো ভাগ করলে বহু বিস্তৃতি স্থান প্রয়োজন হবে। সে যাই হোক যোগীকে স্মরণ রাখতে হবে যে যখনই সংস্পর্শ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে বা ষড়্‌ন্দ্রিয় দ্বারের সহিত সংযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন বেদনা অনুভূত হয়। সুতরাং বেদনা না বলেই চলে যায়, কাজেই তাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। স্পর্শের কারণে কোন না কোন বেদনা ষড়ায়তনের উপর নির্ভর করে ব্যাপক ভাবে উপস্থিত হয়।

বেদনার কারণে তৃষ্ণার উৎপত্তি। অর্থাৎ বেদনার উপর নির্ভর করে তৃষ্ণার উৎপত্তি। যদি দৃশ্যমান বস্তুর উপর নির্ভর করে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তবে তাকে রূপ-তৃষ্ণা বলে। অনুরূপ ভাবে আওয়াজ বশতঃ শব্দ তৃষ্ণা, সুগন্ধী বশতঃ ঘ্রান তৃষ্ণা, স্বাধ বশতঃ রস তৃষ্ণা, স্পর্শ বশতঃ ফোটেঁব তৃষ্ণা এবং মন বশতঃ ধর্ম তৃষ্ণা বলা হয়ে থাকে।

তৃষ্ণার কারণে উপাদান এর উৎপত্তি। অর্থাৎ তৃষ্ণার উপর নির্ভর করে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা, বা অতি প্রবল ইচ্ছা, বা তৃষ্ণার বৃহৎ বিস্তৃতির উৎপত্তি হয়। উপাদান চার প্রকার, কাম উপাদান (ইন্দ্রিয় সুখের প্রবল ইচ্ছা), দৃষ্টি উপাদান (মিথ্যা দৃষ্টির প্রবণতা), শীলব্রত উপাদান (ভ্রান্ত আচরণের মাধ্যমে মুক্তি কামনা) এবং আত্মবাদ উপাদান (গভীর আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি)।

উপাদান প্রত্যয়ে কর্মভব। প্রবল ইচ্ছা বা দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে থাকার কারণে কায়কর্মের উৎপত্তি হয়। বাচনিক কর্ম (বাচনিক কার্যক্রম) মনো কর্ম (মানসিক প্রক্রিয়া) এই তিনটির যে কোন প্রক্রিয়াকে কর্মভব বলে যা তিন নম্বর অংশের সর্বশেষ আবর্তক। প্রথম অংশে অতীতের নৈমন্তিক পরম্পরা, ইহাকে সংস্কার রূপে জানতে হবে।

অভিধর্ম সংগ্রহ অনুসারে লৌকিক কুশল চিত্ত উনত্রিশ প্রকার ।

“কর্মভব এর কারণে জাতি বা জন্ম ।” কায়িক, বাচনিক, মানসিক প্রক্রিয়ার কারণে জাতি (পুনঃ জন্মের চেতনা ) যা পরবর্তী জন্মের প্রারম্ভ (প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান) । যে কোন জাতিই হউক না কেন তা প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের শুরু (পুনঃ জন্ম চেতনা) বুদ্ধ বলেছেন “জাতিপি দুঃখ” অর্থাৎ মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা যাই হোক না কেন জাতি (জন্মই) হল দুঃখ সত্য । দেব বা ব্রহ্ম হউক যে কোন জন্ম প্রকারান্তরে দুঃখকে বরণ করা । এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রত্যেকের পরবর্তী দুঃখজনক জন্মকে দীর্ঘায়িত করবেন কি না? যদি জন্ম গ্রহণ করেও থাকেন তবে তা কিভাবে হওয়া উচিত? তার পরিণামে পুরস্কার কি? উত্তর হল- “জাতি প্রত্যয়ে জরা-মরণ ।” ইহা স্পষ্ট যে জন্মের কারণে জরা-মরণের করালগ্রস্ত হতে হবে । অন্যভাবে বলা যায় বার্ধক্য এবং মৃত্যু অনিবার্য ভাবে জাতির পশ্চাত ধাবিত হয় । আরও সহজ ভাবে বলা যায়- যদি কেউ জন্ম ধারণ করে সে বার্ধক্য, ব্যাধি, দুঃখ, অনুতাপ, বেদনা, অনুশোচনা, হাহতাশের আওতাধীন, যা সমস্ত দুঃখেরই সমষ্টি । চিত্রে উপমা দেওয়া আছে ।

বুদ্ধের শিক্ষা মতে ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের আবর্তন প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ নীতি ।

-----○-----



## নবম অধ্যায়

### অবিদ্যা এবং তৃষ্ণাই প্রতীত্যসমুৎপাদ

#### চক্র আবর্তনের মূল কারণ

যোগীদের জানার খুবই প্রয়োজন যে পুনঃ পুনঃ নিরবিচ্ছিন্ন জন্ম-জন্মান্তরে মৃত্যু প্রক্রিয়ার প্রধান কর্ম কারক কে? এই সংসার আর কিছুই নয় অবিদ্যা তৃষ্ণারই নামান্তর।

চিত্র অনুসারে পাঠকগণ দেখতে পাবেন যে চক্রের মধ্যস্থলে অবিদ্যা-তৃষ্ণা বিদ্যমান। অজ্ঞানতা হল চতুরার্য সত্য না জানার প্রধান কারণ। তৃষ্ণা হল জন্মান্তরের অভিনন্দনকারী প্রবল তৃষ্ণা যাহা কোন বাধা মানে না। কাজেই যোগী বা পাঠকদের মনে রাখ একান্ত কর্তব্য যে প্রতীত্যসমুৎপাদের আবর্তনের মূল কারণ অবিদ্যা-তৃষ্ণা। যখন স্কন্ধের বিপাক উৎপত্তি হবে তখনই বার্ষক্য ও মৃত্যু পশ্চাতধাবীত হবে। স্কন্ধ প্রস্তুতকারী মূল গৃহকারককে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। এখন যোগীদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ হবে যে স্কন্ধসমূহ গঠনকারী মূল কারীগর হল অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা। সুতরাং মূল কারণ অবশ্যই সমূলে উৎপাটন করতে হবে যাতে কোন ফল যেন সক্রিয় না হয়। প্রিয় বস্তুর জন্য ইস্পৃহা বাধা মানে না, সেরূপ অবিদ্যা তার চেয়েও বেশী সক্রিয়। ইহার কার্য-কারণ বশতঃ সংস্কারের উৎপত্তি। তৃষ্ণার কারণে উপাদান উৎপত্তি। আবার সংস্কারের কার্য-কারণ বশতঃ বর্তমান পরিণাম ফলের পরিণতি অর্থাৎ বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ এবং বেদনা পক্ষান্তরে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ।

চিত্র মোতাবেক এক নং অংশে যাকে অতীত কার্য-কারণে পরিণাম বলা হয়েছে তাতে পাঁচটি বিষয় আছে যথা- অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব। এই অতীত পরম্পরার কার্যক্রমই দ্বিতীয় অংশের উৎপত্তি। ইহারা বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ এবং বেদনা বিপাক দান করে এবং বর্তমান

পরিণাম ফল আর কিছুই নয় কেবল মাত্র প্রকৃতির নিজস্ব স্ফুটনসমূহ ।

যদি আরও পর্যবেক্ষণ করা যায় দেখা যাবে যে দ্বিতীয় অংশে বা বর্তমান হেতু বশতঃ ভবিষ্যত পরিণাম বা ফল উৎপত্তি অথবা বর্তমান হেতু বশতঃ ভবিষ্যত ফল । এই অংশে তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা এবং সংস্কার দ্বারা গঠিত । এসব কিছুকে ব্যাখ্যা করলে তাতে বুঝা যায় সমুদয় সত্যের কারণে দুঃখ সত্যের উৎপত্তি । আবার নিশ্চিত হওয়া যায় যে, দুঃখ সত্যের মধ্যে সমুদয় সত্য অন্তর্নিহিত আছে ।

অতীত পঞ্চ হেতু কারণে বর্তমানে পঞ্চ ফল । বর্তমানে (ঘটমান বর্তমান) পঞ্চ হেতুর কারণে ভবিষ্যতের পঞ্চ ফল । এভাবেই ত্রিকালে ঘূর্ণিয়মান প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র আবর্তিত হয় ।

সচ্চ বা সত্য এর যথার্থতায় সমুদয়ে পুনঃ পুনঃ দুঃখ উৎপত্তির কারণ । পৌন পৌনিক দুঃখই সমুদয় সত্য উৎপন্ন করে । এভাবে অবিরাম চলতেই থাকে । একই ভাবে অতীত বর্তমানে পরিণত হয় বর্তমান ভবিষ্যতে, ভবিষ্যত অতীতে এবং অতীত বর্তমানে রূপান্তর হয়- এভাবেই আদি অন্তহীন চক্রাকারে কার্যক্রম চলমান ।

অজ্ঞানতার কারণে মানুষ কুশল অকুশল সমস্ত প্রকার কর্ম করে থাকে যার পরিপ্রেক্ষিতে সে পঞ্চস্ফুটন ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারে না যা সহজ ও নির্ভুল ভাবে বলা যায় দুঃখ সত্য । আবার অবিদ্যা এবং তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হয়ে সাধারণ মানুষ না বুঝে সব ধরনের কাজ নিজের বা পরিবার রক্ষা করে থাকে । যা সন্দেহাতীত ভাবে তাকে অপায় ভূমিতে পতন ঘটায় । অন্য দিকে সে যদি কুশল কাজ সম্পাদন করে এতে তবে তাকে পরবর্তী জন্মে উন্নত ভূমিতে নিয়ে যাবে ।

দৈনন্দিন জীবন ব্যাখ্যা করতে গেলে “ক” দেখল, অনুভব করল, আশ্রয়ী হল, সে অতি প্রবল ভাবে তা পেতে চাইল এবং স্বভাবতই তা আয়ত্ত্বে আনতে চেষ্টা করবে। সে তা পেয়েছে, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কি পেল- প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে সে জাতি বা জন্মই রচনা করল। যখন জন্মধারণ করল- আবার সে অবিদ্যা তৃষ্ণা বিপাকে আবদ্ধ হয়ে সীমাহীন দুঃখ ভোগ করতে হবে।

এভাবে প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের সংযোগ ঘটায়। দ্বিতীয় তৃতীয়ের সহিত এবং তৃতীয় চতুর্থের সহিত সংযুক্ত হয়। এভাবে অনন্ত কাল ধরে আদি অন্তহীন প্রতীত সমুৎপাদ চক্র ক্ষান্তহীন ঘূর্ণিয়মান থাকে। পুরানো চক্রের পরে আবার নতুন চক্র আবর্তিত হয় এভাবে আদিঅন্তহীনভাবে সংস্কার প্রক্রিয়া নিরবধি চলতেই থাকবে। আমরা সকলেই অপরিকল্পিত ভাবে পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ, মুক্তির সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। আমরা কি এখনো তাই করতে থাকব? আমরা কি সজাগ হব না?

ব্যবহৃত চিত্র উল্লেখ পূর্বক পাঠক বর্গকে জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে চিত্র মোতাবেক বর্তমানে আমাদের অবস্থান কোন অংশে? নিশ্চিত উত্তর হবে যে বর্তমানে আমাদের অবস্থান দ্বিতীয় অংশ। যেখানে বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনার দেখা পাওয়া যাবে যাকে শ্রেণী বিন্যাস করলে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত এবং দুঃখ সত্য বলে অবহিত করতে হয়।

অতীতের ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভবের কারণে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি (বর্তমান পরিণাম ফল) সুতরাং প্রথম অংশ হল সমুদয় সত্য। অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশ হল দুঃখ সত্য এবং অপর দিকে মার্গ সত্য ও নিরোধ সত্য লুকানো বা আচ্ছন্ন। এরূপ দুই লোকোত্তর সত্য আমাদের নিকট জ্ঞাত নয়। কারণ আমরা লোকোত্তর

সত্যদ্বয়ের প্রতি যত্নবান হয়ে নির্ভরযোগ্য কল্যাণমিত্র গুরুর নিকট হতে যথার্থ শিক্ষা করার জন্য আবেদন করিনি যার সুশিক্ষায় আর্য্য পথের সন্ধান পাওয়া যেত।

এখন আমাদের পাঠক বর্গকে যুক্তির সহিত নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে দুই লোকোত্তর সত্য প্রত্যক্ষ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আমাদের একান্ত হিতৈষী শ্রদ্ধেয় মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ যা ধারাবাহিক ভাবে দেশনা করেছেন তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হল মার্গ এবং নিরোধ সত্যকে ভাবনা চর্চা হতে উপলব্ধি করতে হবে। বিদর্শন ভাবনা এরূপ ভাবে অনুশীলন করতে হবে, যাতে প্রতীত্যসমুৎপাদের স্পোক চাকার রড, এক্সিস (যাকে কেন্দ্র করে কিছু আবর্তিত হয়) হাভ (কেন্দ্র বিন্দু) ভেঙ্গে চূড়ম্বার হয়ে যায়। যোগীদের কর্তব্য নবম অধ্যায় বার বার পড়া, কর্তব্য যাতে তাঁরা গভীর জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত শিক্ষা বোধগম্য করতে সক্ষম হন।

-----○-----

## দশম অধ্যায়

কিভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদ চক্রের স্পোক (চাকার দণ্ড) হাভ (কাজ কর্মের কেন্দ্রস্থল) অক্ষদণ্ড (যে দণ্ডের সাহায্যে চাকা ঘোরে) চাকার রড এবং রীম এর কর্ম শক্তি প্রতিরোধ এবং ধ্বংস করতে হবে তার বর্ণনা।

নিশ্চয়ই আপনারা মালবাহী গাড়ী দেখেছেন। সেখানে আপনি কেন্দ্রের ডানপাশে এক্সেল বাস্ক বা হাভ দেখতে পাবেন। এসব কিন্তু অবিদ্যা তৃষ্ণার উপযুক্ত নমুনা। ইহাতে চারটি স্পোক আছে। ১। কর্ম পূন্য্যভি সংস্কার ২। অপূণ্য্যভি সংস্কার ৩। রূপ পূণ্য্যভিসংস্কার ৪। অরূপ আনেন্জাভি সংস্কার। চাকার রীম জরা-

মরণের প্রতিনিধিত্ব করে। চাকাকে শক্ত টেকসই করার জন্য এবং অক্ষদণ্ডের অন্যান্য যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে না পড়ার জন্য রীমের এক প্রান্তে এবং অক্ষদণ্ড এর অপর প্রান্তে সংযোজন করা হয়। এজন্য এক্সেল বাস্ক, চাকার রড, হাভ এরবং স্পোক ও রীম সব কিছু মিলায়ে চাকা বলা হয়। কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে পৃথিবীতে রাজা দেবরাজ ইন্দ্র হওয়ার জন্য কুশল চিন্তে দান শীল পুণ্য কর্ম করে থাকেন। এই সমস্ত কাজ প্রতীত্য সমুৎপাদ মতে পুণ্যাভি সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে কেউ কেউ নিজে এবং পরিবারে সকল সদস্য মিলে অকুশল কাজ করে তাতে তাদের চতুর্অপায় বা তীর্যক যোনীতে জন্ম ধারণ করতে হয়। কখনো কেউ কেউ শমথ ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে রূপ ব্রহ্ম ভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহা রূপ পুণ্যাভিসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার অন্য কোন রূপাবচর যোগী রূপের প্রতি বিরক্ত হয়ে অরূপ ধ্যানে রত হন, অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য। (সেখানে কোন রূপ নেই কেবল নাম স্কন্ধ বিদ্যমান) তাকে আনেজ্ঞা সংস্কার বলে।

পূণ্য, অপূণ্য বা আনেজ্ঞা যে সংস্কার বা সংঘটন যাই করুক না কেন তাতে বাধ্যগত ভাবে অজ্ঞাতসারে জরা-মরণের পরিধিতে আরোহন ও অবরোহনের করা হচ্ছে। তাদেরকে অবশ্যই সংস্কার লোকের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অথবা একত্রিশ লোকভূমির কর্মক্ষেত্রের আওতাধীন হতে হবে। যদিও কেউ রূপাবচর ভূমিতে আরোহন করলেও জরা-মরণের রীমের বাহিরে যাওয়ার শক্তি তার নেই। অন্য ব্যাপারে যদি কেউ শমথ ভাবনার মাধ্যমে অরূপ ধ্যান লাভ করে থাকেন তার সীমাবদ্ধতা ও জরা-মরণের রীমের শেষ প্রান্তে।

সংস্কারের কার্যক্ষেত্রে যাই করা হোক না কেন জরা-মরণের দৃঢ় বন্ধন হতে পালাবার কোন উপায় নেই। অতএব যে কোন লোকে পুনঃ জন্ম নেওয়া হোক না কেন জরা-মরণের করালগ্রস্ত

হতেই হবে। সুতরাং পরবর্তী জন্মে উন্নত অবস্থানের জন্য পুণ্যসংস্কার কর্ম করা হলেও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় তাহাও জরা-মরণের কর্মক্ষেত্র। জরা-মরণ হতে রেহাই পাবার সেখানে কোন পথ নেই।

অকুশল সংস্কার, বা অকুশল ক্রিয়া কর্ম যাহা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক যাই করা হোক তা অপায় ভূমির স্পোক বা চাকার দণ্ড সদৃশ্য।

যারা ভুল করে রূপলোক বা অরূপলোককে নির্বাণ বলে বিশ্বাস করেন তারা বিপুল প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধ্যান এবং অভিঞ্জন অনুশীলন করেন। যখন ধ্যানী গভীর ধ্যানে রূপকে দুঃখ কষ্টের উৎস বলে মনে করেন তারা অরূপ ধ্যান লাভ করেন। ইহাও অরূপভূমির স্পোক বা চাকার দণ্ড বিশেষ।

চিত্রের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় তাতে চাকার দণ্ড আছে যা আসক্তির প্রতীক স্বরূপ। পালি মতে আসব সমুদয়ই অবিদ্যা সমুদয়; আসবের চাকার রড বা দণ্ড অবশ্যই চার স্পোক এক্সেল বক্স বা অক্ষদণ্ডের বক্সের সহিত সংযুক্ত যা আগে থেকেই চাকার সহিত সংযুক্ত রয়েছে। এখন চাকা ঘোরানো যাক। যখন চাকা ঘোরে ইহা স্বতসিদ্ধ যে কিছু স্পোক বামদিকে অবস্থান করবে এবং অন্যগুলি নীচের দিকে যাবে এবং কিছু স্পোক বামে আর কিছু স্পোক ডানে থাকবে। শত চেষ্টা স্বত্বেও স্পোক গুলি রীংয়ের বাহিরে আসতে পারবে না। পার্থিব জীবনে, দেবলোক, ব্রহ্মলোক মনুষ্য লোকে তাই সংগঠিত হচ্ছে। সংসার হতে বাহির হওয়ার কোন পথ নেই। এই সংসারের চাকা বিরতিহীন ভাবে ঘূর্ণিয়মান যা পঞ্চস্কন্ধে পুনঃজীবিত করার জন্য আকৃষ্ট করে। সুতরাং যখনই পঞ্চস্কন্ধের অবতারনা বা সমন্বয় ঘটে তা সাধারণত জরা-মরণের চরম ফল লাভ করে।

আবার যদি অর্থ সত্যের সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি- অবিদ্যা তৃষ্ণাই হল স্কন্ধ লাভ এবং প্রতिलाভ করার জন্য একমাত্র দায়ী যা কেবলই দুঃখ স্কন্ধ। অন্যদিকে অবিদ্যা তৃষ্ণা হল সমুদয় সত্য। সুতরাং সমুদয় ও দুঃখই আমাদের সংসার পথ যাত্রার একান্ত সঙ্গী যার কারণে মার্গ এবং নিরোধ সত্য আড়াল হয়ে যায়।

নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি আমরা ইচ্ছা করেই মার্গ ও নিরোধ সত্যকে এড়িয়ে চলি এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রকে দীর্ঘায়িত করার জন্য আমাদের মূল্যবান সময় অপব্যয় করছি।

যাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় ইহা দীর্ঘ মেয়াদী দুঃখ ভোগের ক্রান্তি কাল।

চক্রের প্রথম অংশ মোতাবেক অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান ক্লেশ বর্ত।

সাধারণ মানুষ সবধরনের কাজ করে থাকে যাতে কর্ম ভব উৎপন্ন হয়। এই কর্ম ভবের কারণেই বিপাক বর্ত বা পঞ্চস্কন্ধ বিপাক উৎপন্ন হয়। ক্লেশ বর্ত কর্ম বর্তকে উৎপন্ন করে এভাবে চাকাগুলি অবিরাম ঘুরতে থাকে।

সত্যের দৃষ্টি কোন থেকে তাকালে দেখা যায় কেবল সমুদয় ও দুঃখ সত্যেরই গোলক ধাঁধা।

আবার বর্ত এবং দৃষ্টিকোন থেকে নিরক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় কেবল ক্লেশ, কর্ম এবং বিপাক বর্ত এর ঘূর্ণিপাক।

যখন আবার সময় ও ব্যবধানের দৃষ্টিকোন থেকে দেখি- দেখা যাবে যে এসব কিছু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পর্যায়ক্রমিক আবর্তন।

ইহা সতর্কতার সহিত স্মরণ রাখতে হবে যে প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খল বা সংযোগ যদি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায় তবে আমরা সংসার বর্ত থেকে পালাতে সক্ষম হব।

যতদিন পর্যন্ত প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খলের পুনঃ সংযোজন প্রক্রিয়া কার্যকর থাকবে ততদিন দুঃখের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে না।

যদি আমরা সংসারকে সংক্ষিপ্ত করতে চাই তবে আমাদেরকে তিন বর্তসমূহের মাধ্যমে বাহির হওয়ার পথের অনুসন্ধান করে সমুদয় ও দুঃখকে পরাজিত করতে হবে।

বর্তমান অবস্থানে ধর্মদেশনা বা বই পড়ে সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করা যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যোগীদেরকে চাকার রীং, এক্সেল বাক্স, দণ্ড বা স্পোককে টুকরা টুকরা করে ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যোগী যারা প্রকৃতপক্ষে সংসার হতে পালাতে ইচ্ছুক (কেবল মাত্র ইচ্ছার দ্বারা মার্গ বা ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে না) কেবল মাত্র বিদর্শন অনুধ্যাণ দ্বারা (আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে) অবিদ্যাকে-বিদ্যাতে (জ্ঞান) এবং তৃষ্ণাকে-অলোভ এ পরিণত করে অজ্ঞানতার বন্ধন মোছন করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবেন।

অন্যান্য অধ্যায়ে বন্ধন মুক্তির পথের অনুসন্ধান দেওয়া হবে।

-----○-----

## একাদশ অধ্যায়

যারা প্রতীত্যসমুৎপাদ পথের পথিক তারা অন্ধ মানুষ

চতুরার্য্য সত্য সম্পর্কে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা এবং যার দৃষ্টি অবিদ্যার মেঘে আচ্ছন্ন তাদেরকে পৃথকজন বা (সাধারণত পরমার্থ জ্ঞান সম্পর্কে অসচেতন) বলা হয়।

দুই ধরনের পৃথক জন আছে, যথা- ১। অন্ধ পৃথকজন ২। কল্যাণ পৃথকজন। যে সত্য সম্পর্কে জানেনা তাকে অন্ধ পৃথক জন বলা হয় অথবা অন্ধ পৃথকজন অর্থাৎ যাদের চিন্তাধারা অন্ধ



এবং সবসময় চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করে। তাদের জন্ম অনির্দিষ্ট। কল্যাণ পৃথকজনের সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টি না থাকার কারণে চোরা গর্তে পতন অনিবার্য পরবর্তী জন্মে দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে জন্ম নেওয়ার জন্য পুণ্য সংস্কার মূলক কাজ করে।

যদি কেউ পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ সত্য তা ঘৃণ্য জঘন্য দুঃখ পূর্ণ ও কাম্য নয় এরূপ সম্প্রজ্ঞানে জেনে যদি কেউ দান দিয়ে থাকে তবে তাকেই প্রকৃষ্ট দান প্রণালী বলা যায়। কারণ স্কন্ধসমূহ আর কিছুই নয় কেবল দুঃখ সত্য এই সত্য জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়ে দান কার্য সম্পাদন করেছেন। এধরণের দানকে বিবর্ত কুশল বা অনাসক্ত বলা হয় যাহা শুদ্ধ কর্মের সহিত কৃষ্ণ কর্ম মিশ্রিত হয় না।

কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা বা পরবর্তী উচ্চস্তরে জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা মনে পোষন না করে, কেবল মাত্র সংসার চক্রের কার্য শক্তি রোধ করার জন্য অথবা স্কন্ধ সমূহের অনুপস্থিতির জন্য যে দান কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে বিবর্ত কুশল কর্ম বলে যা কর্ম শক্তিকে চূর্ণ করে দেয়।

এতদ পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত প্রশ্ন হতে পারে- যেখানে সংসার পরিভ্রম অনেক দীর্ঘ, নির্বাণ সাক্ষাত করার আগে হয়ত কোন কোন ব্যক্তি গরীব ঘরে জন্ম নিতে পারে। অভাবী অবস্থানের কারণে তাদের কি পরবর্তী জন্মে বিপুল সুখ সম্পদ উচ্চ স্তরের দেবলোকে দেবপুত্র এবং মর্তে রাজকুমার হয়ে জন্মাবার প্রবল ভূবক্ষা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়?

এখানে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা একান্তই প্রয়োজন। চিরন্তন ভাবে বিশ্বাস করি যেহেতু আমি দান দিচ্ছি এবং এই দানের ফল পরবর্তী জন্মে আমিই উপভোগ করব। এরূপ বিশ্বাসে আমি এবং অহংবোধ বিদ্যমান যাকে দৃষ্টি বা মিথ্যা দৃষ্টি বলা হয়। যখন

বিবেচিত হয় যে আমিই দাতা, আমিই এই দানের ফলভোগ কারী তাও স্বাশত দৃষ্টির শামিল। পাঠক বর্গ বিষয়টির প্রতি বিশেষ ভাবে মনযোগ আকর্ষণ করা দরকার। কারণ ভিক্ষা দেওয়া যদিও বা কুশল কর্ম সেখানে কিন্তু একই কর্মে দুটি জিনিস মিশ্রিত যে আমিই ভিক্ষাদান জনিত পুণ্য ফল আহরণ করার এক মাত্র ব্যক্তি। এই দৃষ্টি কিন্তু আত্ম দৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টি উভয়ই সম্বলিত। এরূপ ভুল মনোভাব থাকা বা আধিপত্য বিস্তার করা মিথ্যাদৃষ্টি। তা কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলা এত সহজ নয়।

### আর একটি উপমা দেওয়া যাক

সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় দান দেওয়া একটি কুশল কর্ম, শুভ কাজ এবং উচ্চ স্তরের প্রত্যাশ্যা হল তৃষ্ণা। এরূপ কর্মকে মিশ্র কর্ম বলা হয়। ইহা শুক্র ও কৃষ্ণ কর্ম উভয়েরই সংমিশ্রণ। অর্থাৎ কুশল কর্ম কুশল কাজ শুক্র এবং উচ্চ স্তরে জন্ম লাভের বাসনা, কৃষ্ণ কর্ম উভয়কে একত্রে মিশ্র কর্ম বলা হয়।

এধরনের কর্মের ফলে নাগ রাজ রাজকীয় শ্বেত হস্তী ইত্যাদি কুলে পুনঃ জন্ম লাভ করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং পাঠকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার যে এধরণের মিশ্র কর্ম তাহাদের করণীয় কি না? আমরা এখন আবার অন্ধের হাঁটার ব্যাপারে আলোচনা করি। আর্য্যসত্য সম্পর্কে অজ্ঞানতাই অন্ধত্বের কারণ। ডান বাম পায়ে হাঁটা পূণ্যাভি সংস্কার এবং অপূণ্যাভি সংস্কার উভয়ই ডান পদক্ষেপ মনুষ্য বা দেব স্কন্ধ ধারণ করে যাহা দুঃখ সত্যেরই নামান্তর। বাম পদক্ষেপ দুর্গত স্কন্ধের উৎপত্তি যা দুঃখজনক অবস্থান।

এই কারণে যখন সম্পূর্ণ অন্ধ (পৃথকজন) অস্থির ভাবে দিক বিদিক শূণ্য হয়ে হাঁটে এবং অজ্ঞানতার সহিত যখন তখন যে কোন কিছু করে তাতে প্রতীত্য সমুৎপাদের পথ প্রদর্শিত হয়।

“সংস্কার পচয় বিঞ্ঞানং” অর্থাৎ সংস্কারের কারণে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখানে বিজ্ঞান প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সম্পূর্ণ অন্ধ ব্যক্তি যখন চলাফেরার সময় পদস্থলন পিছলা খায়, পড়ে যায়, গর্তে পড়ে যা জাতি (জাতিপি দুঃখ) যখন জন্ম লাভ করে তখন তাকে প্রতিসন্ধির কারণে সমস্ত রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়।

আমরা ইহা অনুভব করতে পারি যখন স্মরণ করতে পারব, যখন দশমাস দশদিন পর্যন্ত মল মূত্র পূর্ণ মাতৃ গর্ভে চতুর্পাশের চাপের মধ্যে হাঁটু ও শরীর বক্র করে (নড়াচড়া করার) হাত পা প্রসারিত করার এক ইঞ্চি ফাঁকা জায়গার অভাবপূর্ণ স্থানে যখন অবস্থান করছিলাম। “সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান” অর্থাৎ জাতি বা জন্মের বর্তমান জীবনের প্রারম্ভ মাত্র। আবার বিঞ্ঞা পচয় নাম-রূপ অর্থাৎ জন্মের কারণে নাম-রূপ উৎপন্ন হয়েছে যা নির্দেশ করে,- যে অন্ধ মানুষটি হোচট খেয়ে গর্তে পতিত হয়েছিল বর্তমানে সে আহত হয়েছে।

রূপক ভাবে ব্যক্ত করা যায় যে যখন অন্ধ জন্মের পতন হল, এই পতন কিন্তু সাধারণ পতন নয়- বিবেকহীন হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে নিজে আহত করেছে। ইহার অর্থ সে নাম ও “আহত” রূপ ও “আহত” যা দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়। “পঞ্চুপাদানক্খান্ধাপি দুক্খা”। সমস্ত পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চুপাদান মিশ্রিত সমষ্টিই “দুঃখ সচ্চ”।

আবার আমরা যদি নাম-রূপ পচয় ষড়ায়তন অনুসারে অগ্রসর হই তবে সদৃশ্য বিধান করে ব্যক্ত করা যায় যে যখন তার আঘাতের পর ক্ষত হল তা সেপটিকে পরিণত হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। এই কারণে চক্ষু আয়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন (রসায়তন) কায় আয়তন এবং মনায়তনে ক্ষত বা অহিত সাধিত হল।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন পঞ্চুপাদানস্কন্ধ হল ব্যাধি, পালাজ্বর, ক্ষত, কাঁটার ফোড় ইত্যাদি সদৃশ্য ।

চোখের কারণে দেখতে হয়, কর্ণের কারণে শুনতে হয় । নাসিকার কারণে শ্রাবণ নিতে হয় । জিহ্বার কারণে স্বাদ গ্রহণ করতে হয় । কায় বা শরীরের কারণে স্পর্শ করতে হয় । মনের কারণে ভাব চিন্তার উৎপন্ন হয় । যখন যেখানে যে আলম্বনের সহিত যে দ্বারে সংঘর্ষ বা দৃঢ়ভাব ধারণ করে সেখানে লোভ, দ্বেষ, অথবা সৌমনস্য, দৌর্মনস্য অথবা উপেক্ষা উৎপন্ন হয় ।

যখন অন্ধমানুষ হাঁটে তখন সে ভুল পদক্ষেপ দেয়, হোচট খায়, পতিত হয়, আহত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয় ইহাতে তার সমস্ত শরীর বীজানুঘটিত দূষণে (Septic) পরিণত হয় । আবার ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ- অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তি আবার কাঁটার আঘাতে জর্জরিত অবস্থায় সেপটিক হয়ে মন্দের থেকে অধিকতর নিকৃষ্ট অবস্থায় পরিণত হল ।

এই পতন খুবই ভারী, ব্যথা খুবই যন্ত্রণা দায়ক, অসহ্য কষ্টদায়ক । এই যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের কারণ হল অবিদ্যা ।

অবিদ্যার নেত্রীত্বে এবং তৃষ্ণার সহচর্য্যে এবং তৃষ্ণারই নির্দেশনায় সমস্ত অন্যায়ে কাজ করে থাকে । এভাবে সমুদয়ের কারণে দুঃখ উৎপন্ন হয় ।

“এবমতস্স কেবলস্স দুক্কখন্ধস্স সমুদয় হোতি ।” অর্থাৎ সংসার সংস্কার প্রক্রিয়া কেবল সমস্তই রাশি রাশি দুঃখ পুঞ্জ ।

আবার অন্ধ ব্যক্তি যদি আরও অগ্রসর হয় তবে কাটার ফোঁড় বশতঃ বেদনারই উৎপত্তি হবে ।- “স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা ।” যেখানে যতবার ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটে ততবারই লোভ বা দ্বেষ বা মোহ সৌমনস্য, দৌর্মনস্য ইত্যাদি বেদনা উৎপন্ন হয় । যখন রূপ বা বিষয় দেখা যায় শব্দ শুনায় । স্বাদযুক্ত খাদ্যের সুগন্ধী পাওয়া যায় । কায়ের বা দেহের

স্পর্শ জনিত কারণে এবং কোন পরিকল্পিত বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে বেদনার উন্মেষ বা উৎপত্তি ঘটে।

আমার সমস্ত রকম বেদনার উৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমরা ৯৬ প্রকার দৈহিক পীড়াগ্রস্ত হতে বাধ্য হই। চিত্রের দ্বিতীয় অংশে প্রদর্শন করবে যে সমস্ত অংশই দুঃখ সত্য।

কেবল মাত্র অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা যখন বিদ্যা বা জ্ঞানে পরিণত হবে তখন আমরা সম্যক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাব দুঃখ সত্যের বাস্তব অস্তিত্ব। একারণেই “চক্ষু উদপাদি, ঞ্জ্ঞানং উদপাদি, বিদ্যা উদপাদি বলা হয়েছে। অর্থাৎ- বিদ্যা চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও প্রজ্ঞা চক্ষু- উৎপন্ন হয়েছে।

চলুন আমরা আবার অন্ধ ব্যক্তিকে ব্যথা মুক্ত করার জন্য পুনরায় অন্ধ ব্যক্তির নিকট ফিরে যাই। তার ক্ষত নিবারণ করার জন্য ঔষধের প্রয়োজন। যদিও বা সে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে ক্ষত উপশমকারী ঔষধ সংগ্রহ করার জন্য কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ খুঁজে বেড় করা সম্ভব নয়। ইহাতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ কিছুতেই সঠিক ঔষধ খুঁজে পাবে না- অর্থাৎ প্রকৃত সত্যজ্ঞান অর্জন করতে সম্ভব হবে না।

সব সময় সংসার পরিভ্রমে বিচরণ থেকে উপশমকারী ঔষধের অনুসন্ধান নিষ্ফল ও প্রকৃত কার্য্যতার পর্য্যবশীত হয়। পূর্বজন্মে যেক্রপ বিফল হয়েছে সেভাবে এজন্মেও তদনুরূপ হবে। আমরা অন্ধ পদস্থলিত সত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়- যাদের ঘুরপাক খাওয়া সংসার হতে বিরামহীন ভাবে ঘূর্ণারও বিপাকে দ্রুতগতিতে নিমজ্জিত করেছে।

সমুদয় অতীতের হেতু চলমান প্রক্রিয়া, যাতে সমস্ত রকম দুঃখ-কষ্ট বা ভোগান্তি বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে সমুদয়ই জন্ম জন্মান্তরের দুঃখ কষ্টের সংযোগকারী।

মনে করুন সুখ-বেদনা। ধরুন একটি পরিবার ভাল আয় বশতঃ বাড়ী-গাড়ী সহ ভাল অবস্থায় রয়েছে। যদি সে বর্তমান অবস্থার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয় এতে তার তৃষ্ণার উৎপত্তি হবে। প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রে দেখানো হয়েছে যে “সুখ বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ ইহার সহিত সংযুক্ত।

চলুন আবার আমরা অন্ধ লোকের প্রতি ফিরে যাই। অন্ধ ব্যক্তি যখন উপশমকারী ঔষধের সন্ধান করে, সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় নিশ্চয়ই কোন কোন ঔষধ সে সংগ্রহ করতে পারে যা কিন্তু সঠিক নয়। তা হয়ত সেবনও করতে পারে অথবা বাহির দিকে লেপন দিতে পারে। ইহাতে তার রোগ উপশমও হবে না বরং অধিকতর খারাপ রূপ ধারণ করবে।

প্রতীত্য সমুৎপাদে বলা হয়েছে “উপাদান প্রত্যয়ে কর্মভব।” এর অর্থ এই যে আসক্তির কারণে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়। যখন দান কার্য সম্পাদন করা হয় তখন পরবর্তী পুনঃ জন্মে দেব, ব্রহ্ম হয়ে উচ্চতার সুখময় জীবন সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে জন্মধারণের জন্য প্রার্থনা করে থাকে। শুধু তাই নয় তাদের ছেলে-মেয়ে, পরিবার পরিজনও ভবিষ্যত জন্মে যেন অনুরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়ে পুনঃজন্ম লাভ করতে তারও প্রত্যাশা রাখে। সচ বা সত্য জ্ঞানের অভাবে সাধারণ ব্যক্তি বর্গ এধরণে ভ্রান্তমূলক সম্পাদন করে থাকে। ইহাকেও অন্ধ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায় যে হোচট খেয়ে গর্ততে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত শরীর পরবর্তীতে সেপটিকে বা নিরাময়হীন ক্ষততে ভুগাচ্ছে। আবার অন্ধত্বের কারণে কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে নিরাময়ের জন্য ঔষধ সন্ধান করতে গিয়ে পুনঃরায় ভুল ঔষধ সংগ্রহ করে থাকে।

সব সময় সংসার জীবন পরিভ্রমণ কালে যথা সত্য বা আর্য্যসত্য জ্ঞানের অভাবে বিপরিনামধর্মী সংসার যাত্রা পথ বার বার হেলে দুলে ঘুরপাক খেতে থাকে। স্পষ্ট করে বলা যায় তাদের মার্গ সত্য সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও নেই। অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সামান্যতম প্রচেষ্টা নেই।

সত্যই আমরা খুবই সৌভাগ্যবান, কেননা আমরা নির্বাণগত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ'র দেশনা ধারণকৃত টেপ রেকর্ড হতে সংগৃহীত ও প্রচার বই সমূহ পড়তে পারি। নিঃসন্দেহে সত্য আমরা এ সমস্ত দেশনা হতে প্রতীত্য সমুৎপাদ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ধারণা অর্জন করতে পারি।

পাঠক বর্গকে জোড়ালো ভাবে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে আদি অন্তহীন সংসার শৃঙ্খল হতে এজন্মে নিজদেরকে মুক্ত করার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে পোষন করুন। যেহেতু প্রত্যেকে জন্ম সূত্রে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং সত্যধর্ম শুন্য সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং তারা ধারণকৃত টেপ রেকর্ড প্রকাশিত বই হতে ইচ্ছা করলে সত্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এ সমস্ত রেকর্ড করা ধর্মীয় ভাষন বার্মার মান্দেলী, মোগোক্, অমরাপুরা এবং ব্রহ্মদেশের আনাচে-কানাচে প্রচুর পাওয়া যায়।

আবারও পাঠকদেরকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে যে আর্য্যসত্য ও প্রতীত্য সমুৎপাদ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় মহাথের ছেয়াদ এর জীবিত অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দেশনার বাণীবদ্ধ রেকর্ড হতে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করুন।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### প্রতীত্য সমুৎপাদের প্রতীলোম বর্ণনা

বিপস্বী বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার আগে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় মানব জাতি এবং সচেতন প্রাণী সমূহ যারা অবিরাম প্রক্রিয়ায় জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি-মৃত্যুর সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করে পুনঃজন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে সে বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা মগ্ন হলেন এবং কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে এরূপ জন্ম-জরা, ব্যাধি মৃত্যুর আদি অন্তহীন প্রক্রিয়া হতে মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

যখন তিনি বিরক্তিকর দীর্ঘ সংসার শৃঙ্খলের আদি-অন্তহীন স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন তখন তিনি অভিজ্ঞানে দেখলেন কখন তিনি সম্বোধি জ্ঞান ভবিষ্যতে অর্জন করতে পারবেন যার দ্বারা মানব জাতির আদি-অন্তহীন জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু, সংসার চক্র ভঙ্গ করে পুনঃ জন্ম রোধ করতে পারবেন।

বুদ্ধ পর্যায়ক্রমে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন কোথায় সীমাহীন জন্ম-জরা-মরণ সংঘটিত আছে।

যথাযথ অনুসন্ধান করে ধ্যানের মাধ্যমে অনুলোম প্রতিলোম ভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি করে পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, একমাত্র দায়ী অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা যা দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। আবার তিনি গভীর ভাবে ধ্যান মগ্ন হয়ে অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে জন্ম থেকে জরা-মরণ এবং জরা-মরণ থেকে জন্ম বার বার পর্যবেক্ষণ করলেন প্রথম পর্যায় থেকে আরম্ভ করে তিনি বুঝলেন ইহা অবিদ্যারই প্রচলিত প্রবাহ। শেষ পর্যন্ত তাঁর যখন যথার্থ দৃষ্টি উন্মোচন হল তখন তিনি সমস্ত রকম ক্লেশ চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভেঙ্গে সর্বাসবের মূল উৎপাতন করে প্রতীত্যসমুৎপাদ শৃঙ্খলকে



বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড বিখণ্ড করে চূড়ান্ত ভাবে সর্বজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একই ভাবে আমাদের গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার আগে অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় জরা-মরণ থেকে উৎপন্ন মানব জাতির সীমাহীন দুঃখ কষ্টের বিষয় তাকে নাড়া দিয়েছিলেন। জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যুর আদি-অন্তহীন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর ভাবে অনুধ্যান করে চূড়ান্তরূপে সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেন যা তাঁকে অতল স্পর্শী প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রের সমস্ত প্রক্রিয়া সংযোজনকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে বোধিসত্ত্ব অবশেষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিসম্বোধি জ্ঞান বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হউক বা না হউক প্রতীত্যসমুৎপাদ কার্যক্রম প্রবাহ অটুট থাকবে। কেবল মাত্র পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হলেই অনাবরণ জ্ঞানে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি তত্ত্ব নিখুঁত ভাবে তন্ন করে কোন বিষয় বাদ না দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ ইহা স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্মভব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই নীতি তত্ত্বের মর্ম বস্তু এভাবেই বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যেখানে এই নীতি তত্ত্ব বিদ্যমান সেখানে উহা হবে। ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি ঘটে। ইহা না থাকলে উহার উৎপত্তি হবে না।

চক্রের প্রথম অংশে দৃষ্টি দেওয়া যাক। চতুর্থ অংশে পাঠকগণ দেখতে পাবেন কারণ ছাড়া জন্ম, জরা-মরণ সংঘটিত হয় না। জন্ম হল কারণ এবং মরণ হল কর্মফল। জন্মের পরমূহর্ত থেকে বিতৃষ্ণাজনক বার্ধক্য, ব্যাধি মৃত্যু পশ্চাত্ধাবিত হয়। এতদ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। বৃদ্ধ বয়স বা বার্ধক্য অর্থ যৌবন, যুব সম্পন্ন চেহারা, যৌবন সম্পন্ন চরিত্র হারানো, চুল সাদা হওয়া, কানে কম শোনা, দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ, স্মৃতি শক্তি হারানো, দাঁত হারানোর পরিপ্রেক্ষিতে শক্ত খাদ্য

চর্বনে অক্ষমতা, কারো সাহায্য ব্যতীত হাঁটতে অক্ষম, অধিকতর বার্ধক্যের কারণে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, মল-মূত্রের বেগ নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা এবং ত্যাগের প্রবণতা বেড়ে যায়। দূর্গন্ধ বিশ্বাধ জনিত কারণে একান্ত প্রিয়জনের কাছেও বিরক্তিকর বিরাগভাজন হয়। এই জরা, ব্যাধি, অক্ষমতা আর মরণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহচর কিন্তু তারা সংসার প্রারম্ভ প্রাক্কালের উৎসাহকারী অন্তরঙ্গ সঙ্গী। সুতরাং আমাদের এখনই কি সময় নয় জন্ম, জরা-মরণের সংযোজন ছিন্ন করার? জন্ম, জরা, ব্যাধি মরনের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। আমাদের এই বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার যে আমরা কি প্রতি সেকেণ্ডে-সেকেণ্ডে, মিনিটে-মিনিটে, মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি? আমরা কি বিরতিহীন ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে গন্তব্য স্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছি? ইহাকে “মরণম্পি দুঃখ সচ্চ” বলা হয়। তার অর্থ মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ইহার থেকে বড় যন্ত্রণা দায়ক আর কিছুই নাই। কল্পনা করুন, আমরা বার্ধক্যের সম্মুখীন হচ্ছি। আগে অথবা পরে আমাদেরকে যেকোন বৎসরের যে কোন দিন, যে কোন মাসে, যে কোন সময়ে মরতেই হবে। আমরা জানি না কোন পথে কিভাবে মৃত্যু আমাদের নিকট উপস্থিত হবে?

আমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যেখানে লুকিয়ে থেকে যম-রাজাকে ফাঁকি দিতে পারবেন? নতুবা আমরা অবিশ্রান্ত ভাবে লোভ দ্বেষ মোহকে প্রশ্রয় দিচ্ছি কেন? আমাদের দ্বারা কি সম্ভব হবে মৃত্যুর দিন ক্ষণকে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত মূলতবী রাখতে বলার? আমরা সেসব কারণেই কি অতিপ্রবল ভাবে লোভ, দ্বেষ মোহ গ্রস্ত হচ্ছি? এখনই সময় নিজে নিজে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

প্রত্যেক ব্যক্তি চারজন ঘাতকের সহিত বসবাস করে। ঘাতক পৃথিবী (পৃথিবী ধাতু) আমাদেরকে হত্যা করার অপেক্ষায় আছে। যদি ইহা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী বা অপ্রতুল হয় তবে মৃত্যু

আমাদের অনিবার্য। অন্য ঘাতক আপ (জল ধাতু) আমাদের মাথার উপর হাত রাখার অপেক্ষায় আছে। শরীরে যদি জলের ভাগ বেড়ে যায় তবে প্রস্রাবের প্রবনতা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়। জল্লাদ বায়ুও আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষায় আছে। সেরূপ তেজ বা তাপও অনুরূপ ভাবে সুযোগ সন্ধানে রত। যখন পারদের মাত্রায় তাপ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় অবশেষে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়। ঐ সমস্ত চার ঘাতক ছাড়াও পাঁচ মৌলিক উপাদান বা গঠনে সহায়তাকারী উৎপাদক নরহত্যাকারী খুনী রয়েছে। রাধা নামক একজন ভিক্ষু বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন মার (মৃত্যু) অর্থ কি? মহাজ্ঞানী বুদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন- রূপকে মার বলে বুঝি, সেরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে মার বলে চিহ্নিত করা যায়। ইহার অর্থ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সবাই নরঘাতক খুনী। সমস্ত সচেতন প্রাণী খুনীদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে। খুনীরা অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় রত।

চার খুনীর বা পঞ্চ ঘাতকের শিকার হয়ে মৃত্যু শয্যার চারদিকে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকেও নিজেকে ঘাতকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়। চলুন আমরা চক্রের প্রথম অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

জাতি প্রত্যয়ে জরা-মরণ। জন্মের কারণে জরা-মরণ এর উৎপত্তি। এই জন্ম বড়ই আতঙ্কজনক। জাতি অর্থ সমস্ত স্বেচ্ছাচরিত্র জীব যথা- মানুষ, দেবতা ও ব্রহ্মা।

ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে উল্লেখ আছে, জাতিপি দুঃখা। ইহার অর্থ মানুষ দেবতা বা ব্রহ্মা যারাই জন্ম গ্রহন করুক না কেন- জন্ম নিজেই দুঃখ, সচ্চ এর সঙ্গী হয়ে দুঃখ সত্যের মোকাবেলা করতে হয়।

প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে অজ্ঞানতার কারণে আমাদের বেশীর ভাগ লোকের অস্বাভাবিক ভাবে প্রতারণা মূলক ফাঁদে পা দিতে হয় এবং বিভ্রান্তিকর অগভীর স্বভাব তথাকথিত বিজয় গৌরব বা মোহিনী রূপ বা চমক এর প্রতি মোহিত হয়ে আমরা অজ্ঞজন বিভিন্ন প্রলোভনে দান দেওয়ার সময় বার বার আত্ম অহংকার পূর্ণ বিরক্তিকর পৃথিবীর রাজা, দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মত্ব লাভ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকি।

প্রতীত্য সমুৎপাদ মোতাবেক, পৃথিবীতে রাজা, দেবরাজ ইন্দ্র ও সবই দুঃখ সত্য এবং কারাগার সদৃশ্য। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বলেছেন, “তযো ভবে অন্ধঘরং বিয়” অর্থাৎ ত্রিভুবন হচ্ছে কারাগার ও অগ্নিকুণ্ড স্বরূপ বলে বুদ্ধ অবহিত করেছেন।

পরবর্তী জন্মে মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা হয়ে গৌরবান্বিত জীবন যাপনের প্রার্থনা মেকি, ইন্দ্রজালিক ভ্রান্তিজনক, পক্ষান্তরে তা পুনঃরায় কারারুদ্ধ হওয়ারই অভিপ্রায় মাত্র।

যিনি জন্ম প্রার্থনা করেন তিনি খাড়া পাহাড়ের চুঁড়া হতে অধঃশিরে খাদে পতিত হবেন।

জাতি বা জন্ম অর্থ পুনঃ জন্ম। মাতৃগর্ভের মত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। কেবল মাত্র স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা হেতু মাতৃ জঠরে মল মূত্রের ভাণ্ডে খুব সংকীর্ণ জায়গায় সীমাহীন দুঃখ কষ্টের স্মরণ করতে মানুষ পারে না। চক্রবর্তী রাজা (Monark of the Universe) দেবরাজ ইন্দ্র যাই হোক না কেন জীবনের প্রারম্ভ জন্ম থেকেই। এজন্য নতুন করে জন্মের প্রার্থনা অর্থ কেবল দুঃখ সত্যকে পুনঃ আলিঙ্গন করা।

শ্রদ্ধেয় মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ শিক্ষা দিয়েছেন ভিক্ষান্ন দান করা বা দান ধর্ম সম্পাদন প্রাক্কালে প্রথমে সংকল্প করতে হবে আমি ঘৃণ্য বিতৃষ্ণাও অবজ্ঞা জনক এই পঞ্চস্কন্ধের ভারমুক্ত

হতে চাই দ্বিতীয়ও পুনঃজন্ম মুক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র বা প্রতীত্য সমুৎপাদ সংসার শৃঙ্খল হতে পরিভ্রাণ পেতে চাই।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ আনন্দকে বলেছিলেন “হে আনন্দ পুরাতন স্কন্ধকে ত্যাগ করে নতুন স্কন্ধ ধারণ করাই হল পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ভুল।

নব স্কন্ধ অর্থ নতুন জন্ম লাভ করা এবং নতুন জন্ম লাভ করা অর্থ দুঃখ সত্যকে নতুন ভাবে বরণ করা। যে কোন স্কন্ধ প্রার্থনা অর্থ বার্ষিক্য, জরা-ব্যাদি মৃত্যুরই যাক্ষণ করা। যে কোন জন্ম নিলেই জরা-মরণের সম্মুখীন হতে হবে। কোন কোন রাজা-মহারাজা দেবরাজ ইন্দ্র বার বার একই রূপে, একই অবস্থানে পুনঃ জন্ম ধারণ করার প্রার্থনা করে থাকেন। ইহাতে পক্ষান্তরে তাঁরা পুনরায় বার্ষিক্য, জরা, ব্যাদি মৃত্যুর বার বার অধীনস্ত হতে হয়।

এভাবে অবিদ্যাগ্রস্ত এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব সম্পর্কে প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি সংসার চক্রে ঘূর্ণিবর্তে পতিত হয়।

প্রশ্ন করা যায় জাতি বা জন্ম কি নিজস্ব বা বিশৃঙ্খলতার কারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে? অথবা অন্য কোন মূল কারণ রয়েছে। হাঁ, মূল কর্মই একমাত্র দায়ী যা জন্মের চেয়ে বেশি আতঙ্কজনক। কারণ ইহা চক্রের তৃতীয় অংশ চতুর্থ অংশের সহিত সংযুক্ত করে (ভবিষ্যত পরম্পরার সংযোগ) এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নতুন জন্ম পরিগ্রহণ নতুন ভাবে দুঃখ-কষ্টের সূত্রপাত মাত্র। ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ এর সহিত সংযোগের মধ্যস্থতাকারী। কর্মভব হল কায় কর্ম, বাক্য কর্ম, মনো কর্মেরই প্রক্রিয়া অথবা তাকে পুণ্য সংস্কার, অপুণ্য সংস্কার এবং অনেজ্ঞা সংস্কার বলা হয়।

প্রতীত্য সমুৎপাদ অনুসারে- অতীত যে কর্ম করা হয়েছে তাকে সংস্কার- বর্তমানে যে কার্য্য করা হয়েছে তাকে কর্মভব। এসব কিছু একই অর্থ মনে হলেও অর্থ কিন্তু ভিন্ন।

এ সূত্রে সামান্য মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন সূর্য উদয় হতে সূর্যাস্ত বা ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একদিনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কতবার কায় কর্ম, বাক্য কর্ম এবং মনোকর্ম করে থাকি? বুদ্ধ বলেছেন “সব্বম্পি ভবগামি কস্মৎ কস্মভব” অর্থাৎ পৃথিবীতে কুশল বা অকুশল কর্ম যা কিছু করিনা কেন পরবর্তী জন্মে কর্মের ফল প্রদান করবেই। অন্য অর্থে ভবিষ্যত জন্মের আমিই আমার ভাগ্য বিধাতা বা অদৃষ্টের রূপকার।

আমরা যদি একটু পিছন ফিরে তাকাই দেখব যে কর্মভব নিজেই বা অন্য কোন কারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। “উপাদান প্রত্যয়ে কর্মভব”। উপাদানের কারণে কর্মভব উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কায় কর্ম, বাক্য কর্ম ও মন কর্মের কারণে উপাদান (দৃঢ় গ্রহণ বা দৃঢ় আসক্তি) এর উদ্ভব। প্রতীত্য সমুৎপাদ বা প্রতিসম্ভিদা মার্গ অনুসারে উপাদানকে সমুদয় সত্য এবং কর্মভবকে দুঃখ সত্য বলা হয়। আমরা যদি পুনঃরায় এক কদম পিছায়ে উপাদানের কারণ অনুসন্ধান করি তবে দেখব যে মূল জন্মের দায়ী হল তৃষ্ণা- “তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান।” যখন তৃষ্ণা তীব্র হয় তখন তা উপাদানের রূপ ধারণ করে। তৃষ্ণা হেতু যদি উপাদানের উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে, তৃষ্ণা উপাদানের চেয়ের বেশি আতঙ্ক ও বিপদ জনক।

ইহা স্পষ্ট যে সূর্য উদয় হতে মধ্য রাত পর্যন্ত বা দিন রাত জনসাধারণ, এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে, পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে, এক শহর হতে অন্য শহরে, একদেশ হতে অন্যদেশে, এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বিভিন্ন রকম, যানবাহন,

গাড়ী ঘোড়া, স্টীমার পথে বা উড়োজাহাজে যাতায়াত করে থাকে। এ সমস্ত যাত্রা সমুদ্র বা উড়োজাহাজ ইত্যাদি কেবল মাত্র তৃষ্ণার (লোভ) উৎসাহে হয়ে থাকে। মানুষ তৃষ্ণার দাস হয়ে যেকোন আবহাওয়ায়, বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন দিকে ব্যবসার নামে পরিভ্রমণ করে থাকে।

তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হয় মানুষ, মধ্যরাতে ঝড়-বৃষ্টিতে, ডাকাত বিড়ম্বিত স্থানে বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করে থাকে। যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন তৃষ্ণার দাস লোভের কারণে প্রচেষ্টার কোন বিরাম নেই। দাস কি কভু বলতে পারে তৃষ্ণা আমার নয় ইহা প্রভুর? কখনও না। তৃষ্ণা শক্তিশালী, প্রভাবশালী এবং অবিচলিত, জোড় পূর্বক গড়াগড়ি দেয়। সেরূপ বয়স্ক ব্যক্তির দাসজ্ঞানোচিত অধম কাজ করতে দ্বিধা করে না।

যাচাই করলে খুবই ভাল হয় যে কি বলা হয়েছে আর আমরা কি করছি? চলুন আমরা আরো পেছনের দিকে তাকাই। তৃষ্ণা কি নিজে নিজেই উৎপন্ন হয়- নতুবা কোন কারণ বশতঃ উৎপত্তি হয়ে থাকে? “বেদনা প্রত্যয়ে সংস্কার।” বেদনার কারণেই সংস্কার উৎপন্ন হয়- কারণ বেদনা মারাত্মক বিড়ম্বনাময় চক্রে দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বেদনা তৃষ্ণার সহিত অঙ্গা-অঙ্গি ভাবে জড়িত। যোগীদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে বেদনা তৃষ্ণার সহিত সংযোজিত হতে না পারে। অথবা মার্গাঙ্গ (পঞ্চ মার্গ) বেদনা ও তৃষ্ণার মধ্যস্থলে অবস্থান নিতে হবে। ইহার মর্ম এই সংযোগস্থলে যোগীকে অবশ্যই স্মৃতি অনুশীলন করতে হবে। যাতে অবিদ্যা-বিদ্যায় পরিণত হয়- “বিজ্ঞা উদপাদি।”

বেদনা প্রত্যয় তৃষ্ণাকে প্রতিস্থাপন করে বেদনা পচয় পণ্ড্রা বা বেদনার কারণে প্রজ্ঞা উৎপন্ন করার প্রণালী পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### সৎকায় দৃষ্টি

#### কারণ এবং পরিণাম ফল

সৎকায় দৃষ্টি হচ্ছে-

স- নিজ কায় = স্কন্ধ সমূহ

দিট্ঠি = মিথ্যাদৃষ্টি

“সন্তো কায়ো সৎকায়ো” পরমার্থত পঞ্চস্কন্ধ সমূহ বিদ্যমান। দিট্ঠি হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টি। অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের প্রতি ব্যক্তি, সত্ত্ব প্রাণী আমি সে পুরুষ স্ত্রী বলিয়া আসক্ত হয়।

সৎকায় (স=নিজ, কায়= স্কন্ধসমূহ) অর্থ পঞ্চস্কন্ধ সমূহের সমষ্টি যা সত্য সত্যই বিদ্যমান। দৃষ্টি অর্থ মিথ্যাদৃষ্টি। এই দুই শব্দ মিলেই সৎকায় দৃষ্টি গঠিত হয়।

কিভাবে এবং কোন উপায়ে সৎকায় দৃষ্টির উৎপত্তি? যখন পঞ্চস্কন্ধ দৃষ্টিগোচর এবং এই স্কন্ধ সমূহকে অহং, আমি, আমার বলে ধরে নেওয়া হয় তাকেই সৎকায় দৃষ্টি বলে কল্পনা করা হয়। এই সৎকায় দৃষ্টিই একত্রিশ লোকভূমিতে (৪ অপায় ভূমি, ১ মনুষ্য ভূমি, ৬ দেবলোক ও ২০ ব্রহ্মলোক) খুবই ক্ষতিকারক।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ বলেছেন- “বজ্জানং ভিক্ষবে মিচ্ছাদিট্ঠি পরমানি” ভিক্ষুগণ বিপরিনাম ধর্মীর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে এই মিথ্যাদৃষ্টি। কলাই বা মটর, নুড়ি যেমন জলে ডুবিয়া যায় ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যে কমপক্ষে ২০ প্রকার সৎকায় দৃষ্টি সুগতি ভূমিতে উৎপন্ন হতে বাঁধা দান করে। অপায় পতন অব্যশস্তাবী।



সৎকায় দৃষ্টি থেকে শুরু করে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি উৎপত্তি। তাতে আত্মদৃষ্টি, সৎকায় দৃষ্টি মূলে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি উৎপত্তির কারণ।

সৎকায় দৃষ্টি হল ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি উৎপাদনকারীর সূতিকাগার। এজন্য বুদ্ধ-

সত্তিয়া বিয় ওমথো, দহম্মানোব মত্তকে,

সন্ধায়দিট্ঠি পহানায সতো ভিক্খু পরিবজ্জে।

যারা সৎকায় দৃষ্টি সম্পন্ন তারা মাথায় আগুন বুকে শেল বিদ্ধ যন্ত্রণা নিয়ে জীবন যাপন করে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত পেতে হলে আগুন নিভানো শেল উৎপাটনের পূর্বে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সৎকায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন ব্যক্তিবর্গ দান শীল ভাবনার দ্বারা সুগতি ভূমিতে জন্ম নিতে সক্ষম হবে কিন্তু মার্গ ফল লাভ করা সুদূর পরাহত। যারা সৎকায় দৃষ্টি সম্পন্ন তারা মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা এমন কি বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত করেও অনুতাপ বা অনুশোচনা করে না। এমন কোন অকুশল কর্ম নাই যা করতে দ্বিধা বোধ করবে। ইহা সেই সৎকায় দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে দেবদত্ত বুদ্ধ হত্যা করে নিজে বুদ্ধ হওয়ার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাতে ইতস্তত করেনি।

রাজকুমার অজাতশত্রুকে দেবদত্ত কুমন্ত্রনা দিয়েছিল যে যতদিন পর্যন্ত মহারাজ বিশ্বিসার জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি সিংহাসন আরোহন করতে পারবেন না। ইহাতে প্ররোচিত হয়ে যৌবনে রাজা হওয়ার জন্য তার পিতাকে বিভিন্ন কায়দায় হত্যা করেছিলেন। ইহা সেই সৎকায় দৃষ্টি যার প্ররোচনায় তিনি বুদ্ধ পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

ইহাও সেই সৎকায় দৃষ্টি যার কারণে পটাচারা (একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা) বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে বাধ্য হয়েছিল।

মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তদৃষ্টির দ্বারা আসক্ত হয়ে পঞ্চক্কন্ধ সম্পর্কে ভুল ধারণা বশতঃ স্বামী, সন্তান, মাতা-পিতার ব্যাপারে ভ্রান্ত দৃষ্টির কারণে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে উন্মাদ পাগলে পরিণত হয়েছিল।

যার সৎকায় দৃষ্টি আছে সে ঘুড়ির মত সুতার দৈর্ঘ্যতাসম আকাশে উড়ে এক সময় মাটিতে নেমে আসে কারণ ইহা সেই সৎকায় দৃষ্টি যা তার সহচর। ইহার দ্বারাই পতন ঘটে থাকে।

বুদ্ধ বলেছেন- উচ্ছিন্ন পুণ্ড্রতেজেন কামরূপ গতিং গতা ভবগ্নান্তম্পি সম্পত্তা, পুন গচ্ছন্তি দুগ্নতিং।

ইহার অর্থ কুশল কর্ম বশতঃ হয়ত কামলোক, রূপলোক, অরূপলোকে উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু তাকে অবশ্যই দুর্গতিতে নেমে আসতে বাধ্য হতে হবে- কারণ তার ভিতরে সৎকায় দৃষ্টি অন্তর্নিহীত রয়েছে।

মৌলিক সৎকায় দৃষ্টি হতে মারাত্মক বিপদজনক চারটি মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন করে যা অক্রিয়া দৃষ্টি। নাস্তিক দৃষ্টি, অহেতুক দৃষ্টি এবং ঈশ্বর নির্মাণ দৃষ্টি।

অক্রিয়া দৃষ্টি- এই মিথ্যাদৃষ্টির প্ররোচনা দেয় যে সমস্ত কার্যক্রম, যেমন- শারিরীক, মানসিক, বাচনিক, কুশল বা অকুশল, শুদ্ধ বা ভুল, নৈতিক বা অনৈতিক যে কোন কর্ম করুক না কেন সবই পরিণাম ফল বর্জিত নিষ্ফল ও বন্ধ্য নিরর্থক কোন ফল বয়ে আনে না।

অহেতুক দৃষ্টি- সম্পূর্ণ অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান কারী অপরিকল্পিত রীতি বিবর্জিত ধারাবাহিকতা হীন নীতি অথবা অন্য মতে- জীবন্ত বা মৃত বস্তু বা দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তু সংশ্লিষ্ট যাই ঘটুক না কেন সবই আকস্মিক এবং দেব ঘটনা চক্রে সুযোগ মত ঘটে থাকে। যা অকার্যকর ও অসিদ্ধ কারণে ঘটে।

নাস্তিক দৃষ্টি- ভুল বা অযৌক্তিক মতবাদ যা কার্য-কারণ সম্পর্কিত পরিণাম ফলকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার বা সত্য বলে

স্বীকার করে না। এই নীতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যে জীবন্ত বা মৃত বা দৃষ্টি বিষয়ভূত বস্তুর উৎপত্তি কারণ বিহীন এবং কুশল-অকুশল কোন কর্মের কোন পরিণাম ফল বয়ে আনে না। সব কিছু শূণ্য স্থিতি। কোন কর্মকে অস্বীকার করা অর্থ ফলকেও স্বীকৃতি না দেওয়া এবং দৃষ্টি সমূহের যে কোন একটির উপস্থিতি পঞ্চ অন্তরায় কর্মের পরিণাম ফল থেকেও বেশি অনিষ্টকারী ও মারাত্মক ক্ষতিকর। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত বা পতিত না হই।

-----○-----

## চতুর্দশ অধ্যায়

### সৎকায় দৃষ্টির উৎপত্তি কিভাবে হয়

এক সময়ে রাজগীর বেনুবন বিহারে বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন। সে সময় বিশাখ নামে এক শ্রেষ্ঠী তথায় বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ধর্মদিন্না যিনি পরবর্তীতে ভিক্ষুণী ধর্মে প্রব্রজিতা হয়েছিলেন। প্রতিদিন বিকালে শ্রেষ্ঠী বিশাখ বুদ্ধের দেশনা শুনার জন্য বিহারে গমন করতেন। প্রত্যাবর্তন কালে তার প্রিয়তমা স্ত্রী দরজায় সম্বলিত বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহে প্রবেশ করতেন। একদিন ধর্মদিন্না প্রতিদিনের মত গৃহদ্বারের অপেক্ষায় রত ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বাহু প্রসারিত না করে গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রবেশ করলেন, এতে ধর্মদিন্না মনক্ষুন্ন হয়েও নীরব রইলেন। ঘুমাবার সময় ধর্মদিন্না বিশাখকে জিজ্ঞাসা করলেন আজ বিহারে যাওয়ার প্রাক্কালে আমি কি আপনার প্রতি আপত্তিজনক আচরণ করেছি, যে জন্য আপনি আমার প্রতি গম্ভীর ভাব পোষন করছেন? তখন বিশাখ উত্তর দিয়েছিলেন কোন ভুল আচরণ কারো প্রতি কেউ করেনি। কেবল মাত্র তিনি সম্যক দৃষ্টি (অনাগামী ফল) লাভ

করার কারণে চিন্তাশীল আচরণ করেছেন। শ্রেষ্ঠী তখন ধর্মদিন্নাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার যত স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তি রয়েছে সব কিছু তোমাকে দান করে দেব, এমন কি তুমি তোমার পছন্দের লোকের সহিত পুনঃ বিবাহের অনুমতি দেব যদি তুমি আমার উপর স্বামীত্বের দাবী পরিত্যাগ কর।

এতদ্পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মদিন্না প্রশ্ন করেছিলেন “ভ্রাতা”, আপনি উচ্চতর জ্ঞানের কথা বলছেন। সেই জ্ঞান কি কেবল পুরুষেরা অর্জন করতে পারে? স্ত্রী লোকেরা কি সেই ধর্ম হতে বঞ্চিত?

শ্রেষ্ঠী বললেন “ভগ্নি” তা কিম্ব নয়। বুদ্ধের ধর্ম স্ত্রী পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত।

তখন ধর্মদিন্না বললেন আমাকে অনুগ্রহ করে ধর্মশূনার অনুমতি দেন। অল্প কিছুদিন ধর্ম শ্রবণ করে তিনি ভিক্ষুণী ধর্মে প্রব্রজিতা এবং কালক্রমে অরহত ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রেষ্ঠী বিশাখ ও ধর্মদিন্নার মধ্যে প্রশ্ন উত্তর পর্বের অবতারণা করা হল :-

বিশাখ জিজ্ঞাস করলেন মহাশয়া সৎকায় সম্পর্কে বুদ্ধ কি শিক্ষা দিয়ে থাকেন?

অরহত ধর্মদিন্না উত্তর দিলেন “দায়ক বিশাখ পঞ্চ স্কন্ধসমূহ অর্থাৎ রূপ-উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধকে বুদ্ধ সৎকায় বলেছেন।

আর্য্যা সৎকায় সমুদয় কাকে বলে? হে উপাসক, যে সমস্ত তৃষ্ণা বা কামনা, বাসনা ও আসক্তি যা সংসার আবর্তনকে অভিনন্দিত করে তাকে বুদ্ধ “সঙ্কায় সমুদয়” বলেছেন।

হে আর্য্যা সৎকায় নিরোধ কাকে বলে? হে উপাসক! সংসার চক্রের কারণ সমূহ নিবৃত্তি, তৃষ্ণা ক্ষয় ও পুনঃজন্মের অভাব নির্বাণকে বুদ্ধ সৎকায় নিরোধ বলেছেন।

হে আর্য্যা! দয়া করে বলুন উপাদান যে বলা হয়েছে সেটা কি? উপাদান স্কন্ধকে বুঝায়? না উপাদান স্কন্ধ ছাড়া অন্য কোন উপাদান আছে?

হে উপাসক! পঞ্চ উপাদান স্কন্ধকে উপাদান বলা হয় না। তবে আবার এই পঞ্চ উপাদান ছাড়াও উপাদান হয় না। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের প্রতি তৃষ্ণা ও আসক্তিকে উপাদান বলা হয়।

শ্রদ্ধেয়া সৎকায় দৃষ্টি কিভাবে উৎপন্ন হয়? হে উপাসক! ইহলোকে যারা চতুরার্য্য সত্যকে জানে না, দর্শন করে না, এরূপ পৃথকজন ব্যক্তিরূপে আত্মা আছে, আত্মার রূপ আছে, বেদনাকে আত্মা, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা, আত্মাতে বেদনা আছে বলে বিশ্বাস করেন। সংজ্ঞাকে আত্মা, আত্মার সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা আছে এরূপ বিশ্বাস রাখেন, সংস্কারে আত্মা, আত্মায় সংস্কার, আত্মাতে সংস্কার, সংস্কারে আত্মা আছে বলে বিশ্বাস রাখেন এবং বিজ্ঞানকে আত্মা, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানেতে আত্মা, আত্মাতে বিজ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাস বা দৃষ্টিকে “সৎকায় দৃষ্টি” বলা হয়।

দায়ক বিশাখ, ইহা এরূপ- যেমন কোন ব্যক্তি জ্বলন্ত আগুনকে অগ্নিশিখা হতে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারে না। শিখাকে জ্বলন্ত আগুন বলে মনে করে থাকে। অনুরূপ অজ্ঞ ও অভাবুক ব্যক্তিগণ যারা নৈতিক উপদেশ পূর্ণ ধর্মদেশনা শুনে অশ্রদ্ধা নয় এবং কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং কোন বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিতে হবে সে সববিষয়ে সচেতন নয়। রূপের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্বাস করে আমি ও অহংবোধে মগ্ন হয়। বেদনা আমার স্বতন্ত্রবোধ, সংজ্ঞা আমার আত্ম মর্যাদা, সংস্কার আমার ও আমিই এবং বিজ্ঞান আমার আত্মকেন্দ্রিকতা। এভাবেই সৎকায় দৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

শ্রদ্ধেয়- কিভাবে সৎকায় দৃষ্টি নিরোধ হয়?

## যমক সূত্র

### (সংযুক্ত নিকায়)

যখন ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন ভিক্ষু যমক মনে করতেন অরহতেরা যখন দেহ ত্যাগ করেন তখন কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। বিলুপ্ত হয় এবং বিস্মৃতিতে ডুবে যায়। তিনি এভাবেই বুঝে এবং বিশ্বাস করে অন্যদের নিকট তাঁর এই মন্তব্য ব্যক্ত করতেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তার কথা শুনে তাঁকে মৃদু ভৎসনা করে বলত মহাজ্ঞানী বুদ্ধ এই শিক্ষা দেননাই গ্রহে। যমক কারো কথা না শুনে অবাধ্য হয়ে মহাজ্ঞানী বুদ্ধের তত্ত্বগত শিক্ষার বিপরীতে বেখাপ্লা মতবাদ বলে বেড়াতে লাগলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাকে এ ধরনের কদর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব বলা থেকে বিরত রাখতে না পেরে অনন্য উপায় হয়ে মহাথের সারিপুত্রের নিকট নালিশ করলেন। মহাথের অনুকম্পা বশতঃ যমকের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- যমক ইহা কি সত্য তুমি কি মহান বুদ্ধের তত্ত্বগত শিক্ষার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে চলেছ? ব্যাপারটি সত্য বলে স্বীকার করার পর মহাথের যমককে জিজ্ঞাসা করলেন “হে যমক- ইহা কি সত্য তুমি ভ্রান্ত দৃষ্টির আশ্রয় নিয়ে ব্যক্ত করছ যে অরহতেরা দেহ ত্যাগে কিছুই সংঘটিত হয় না কেবল মাত্র বিলুপ্ত এবং বিস্মৃতি ডুবে যায়?

যমক হাঁ সূচক জবাব দিলেন। তখন মহাস্থবির আবার জিজ্ঞাসা করলেন হে যমক ইহাকে তুমি কি ভাবে বিবেচনা কর? তোমার যা ইচ্ছা উত্তর দিতে পার। রূপ কি নিত্য এবং চিরস্থায়ী?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে- না, তা নহে। বেদনা কি- সুখদায়ক না দুঃখ দায়ক, নিত্য না অনিত্য?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে- বেদনা অনিত্য ও দুঃখ দায়ক।

সংজ্ঞা কি- সুখকর না দুঃখকর, নিত্য না অনিত্য?

না ভাস্তে- দুঃখময় ও অনিত্য ।

সংস্কার কি- নিত্য কি অনিত্য?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে- সংস্কার অনিত্য ও দুঃখময়

বিঞ্ঞা কি- নিত্য কি অনিত্য?

পূজনীয় ভাস্তে- বিঞ্ঞান অনিত্য ও দুঃখময় ।

তখন মহাথের যমককে বলেছিলেন তোমাকে অবশ্যই রূপকে দেখে উপলব্ধি করতে হবে যে রূপ ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর । অনুরূপ ভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের স্কন্ধের প্রসঙ্গে মনে ধারণ করতে হবে যে ইহারাও ক্ষণস্থায়ী এবং প্রতি মূহুর্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে ।

যমক এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব- তুমি তোমার ইচ্ছা মত উত্তর দিতে পার ।

তুমি কি রূপকে অরহত (সত্তা) রূপে বিবেচনা কর?

না- শ্রদ্ধেয় ভাস্তে- না ।

তুমি কি, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানকে অরহত (সত্তা) রূপে বিবেচনা কর?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে তাও নহে ।

তুমি পঞ্চস্কন্ধকে অরহত (সত্তা) রূপে গণ্য কর?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে তা নহে ।

যমক তাহলে কি পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে অরহত (সত্তা) বলে বিবেচনা কর? না ভাস্তে অন্য কিছুকে কি অরহত বলে বিবেচনা কর? তাও নয় শ্রদ্ধেয় ভাস্তে ।

যমক বেদনা ছাড়া অন্য কোন কিছুকে কি অরহত (সত্তা) বলে বিবেচনা কর?

না- ভাস্তে না ।

তাহলে কি যমক সংজ্ঞা, সংস্কারকে অরহত বলে বিবেচনা কর? শ্রদ্ধেয় ভাস্তে তা নহে।

যমক বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুকে কি অরহত (সত্তা) রূপে বিবেচনা কর?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে তাও নয়।

ইহা যদি এরূপই হয়, যমক তবে তুমি কি করে বল মহান বুদ্ধ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে অরহত দেহত্যাগের পর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কেবল মাত্র অদৃশ্য হয়ে বিস্মৃতিতে ডুবে যায়?

না শ্রদ্ধেয় ভাস্তে- আমার পক্ষে এ কথা বলা উপযুক্ত এবং যুক্তি সঙ্গত হয়নি।

এখন যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে অরহত এর দেহ ত্যাগের পর তাদের কি অবস্থা হয়? তুমি কি উত্তর দেবে?

শ্রদ্ধেয় ভাস্তে আমি উত্তর দেব যে রূপ ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী এরবং বিপরিনাম হতে বাধ্য ও অনিত্য। বিজ্ঞানও ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল অস্থায়ী। পঞ্চস্কন্ধও ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণিক, পরিবর্তনশীল ও অনিত্য।

মহাথের বললেন খুবই ভাল যমক, খুবই ভাল। এখন তুমি জাগতিক সত্যকে বুঝে সম্যক দৃষ্টি লাভ করেছ।

যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যাদৃষ্টি থাকবে ততক্ষণ দুইটি ভ্রান্ত ধারণা আবদ্ধ থাকবে। যথা- অরহতকে পৃথক আত্মা হিসাবে বিবেচনা করা হল সংকায় দৃষ্টি। অন্য ভ্রান্ত ধারণা হল অরহতের দেহ ত্যাগের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল মাত্র অন্তর্নিহিত হয়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায়- তা উচ্ছেদ দৃষ্টি। সর্ব উপরি যমক এ সমস্ত কিছুর বিবেচনায় নির্বাণ অকার্যকর।



এখন দৃঢ়তার সহিত নিরূপণ করা যায় সৎকায় দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নির্বাণ বোধগম্য নয়। যে ধারণা বশতঃ বিবেচনা করা হয় অরহতের দেহত্যাগের পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় তাও ভ্রান্ত ধারণা যার অর্থ সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নির্বাণে বর্ণিত বিষয়ে ত্যাগ যোগ্য।

ইহা খুবই মারাত্মক যে সৎকায় দৃষ্টির দরুন যতই পরাক্রমশালী হয়ে স্মৃতি অনুশীলন করুক না কেন- চূড়ান্ত বন্ধনমুক্তি স্তরে পৌছাতে পারবে না।

প্রতীত্য সমুৎপাদের নির্ভরশীল তত্ত্ব সমূহের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রবাল্য অস্বাভাবিক নয়।

### ছন্ন থের

আর্যসত্য জ্ঞান অন্বেষনে কুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পর রাজপরিবারের সদস্য ছন্ন থেরও তাকে অনুসরণ করেছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের কিছুদিন পরে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বিদর্শন ধ্যান অনুশীলন করার পরও তিনি প্রথম স্তর অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তিনি সবাইকে বলতেন যদিও তিনি অনিত্য দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন তবুও মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। হ্যাঁ চল্লিশ বৎসরাধিক একান্তভাবে প্রচেষ্টা করে স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রথম স্তর অনুধাবন করতে অক্ষম। তিনি জানতেন যে রূপ ক্ষণস্থায়ী এবং সেরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানও। যখন অনাত্ম বিবেচিত হত তখন তিনি অনুভব করতেন যদি তিনি পর্বতের একদম চূড়ায় যে কোন মুহূর্তে গভীর প্রপাতে পতিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি আরও গভীরে গিয়ে বলতেন যদি সমস্ত পঞ্চস্কন্ধ সমূহ অনাত্ম হয় তবে

তিনি কাকে বিবেচনা ও আশ্রয় নির্ভরশীল হবেন। ইহা স্পষ্ট যে তিনি আত্মা সম্পর্কে বেশী বাস্তবানুগ হয়েছিলেন। সুতরাং যখনই আত্মা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন থাকতেন তখন তিনি পতনের ভয়ে রোমাঞ্চিত হতেন। চল্লিশ বৎসর থেকে অধিক সময় কেটে গেল- বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন কিন্তু তিনি স্রোতাপত্তি মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন নি।

বিষন্ন অনুতপ্ত ভিক্ষু ছন্ন বিহার হতে বিহারে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষুদেরকে কাকুতি মিনতি করে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন।

অবশেষে তাঁর মনে হল শ্রদ্ধেয় আনন্দ থেরই একমাত্র ব্যক্তি যার নিকট অনুরোধ করলে আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবেন। তাই তিনি বিহারের দ্বার বন্ধ করে কৌসাম্বিতে যেখানে আনন্দ থের অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে সব কিছু ব্যক্ত করার পর আনন্দ থের সাথে সাথেই অনুধাবন করেত পারলেন যে কেবল মাত্র প্রতীত্য সমুৎপাদ জ্ঞানের অভাবই ছন্নের অজ্ঞতার কারণ। এতদ্পরিপ্রেক্ষিতে মনতানির পুত্র কাচায়নকে বুদ্ধ যে ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই শ্রদ্ধেয় আনন্দ থের ছনকে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব উত্তম রূপে শিক্ষা করে ভিক্ষু ছন্ন সৎকায় শ্বাশত ও উচ্ছেদ দৃষ্টি সমূলে উচ্ছেদ করে প্রথম স্তর স্রোতাপন্ন মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে কেবল মাত্র প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে তত্ত্বগত শিক্ষার অভাবেই চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল ভিক্ষু ছন্ন প্রথম স্তর লাভ করতে বিলম্বিত হয়েছিল।

ইহা বলা নিঃপ্রয়োজন যে সব যোগী গভীর ভাবে স্মৃতি অনুশীলন করতে আগ্রহী তাঁদের অবশ্যই তত্ত্ব শিক্ষা অপরিহার্য।

যতক্ষণ পর্যন্ত যোগীগণ এই তত্ত্বগত শিক্ষা নিখুঁত ভাবে অনুধাবন করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত স্কন্ধ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্থাৎ স্কন্ধের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি জ্ঞান যা স্কন্ধসমূহের সহিত সহ অবস্থান করে সেই দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে না। যেখানে দৃষ্টি নাছোড় বন্ধার মত অটল সেখানে আমন্ত্রণ যোগ্য অবিচ্ছেদ্য বন্ধু হল- অবিদ্যা তৃষ্ণা অবশ্যই উৎপন্ন হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করবেই।

আগে বলা হয়েছে মিথ্যাদৃষ্টি অবিদ্যা তৃষ্ণার থেকেও বেশী মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। কারণ যেখান থেকে উচ্চতর মার্গ ও ফলের শুরু সেই প্রথম স্তর স্রোতাপনের পথ রোধ করে অবস্থান করে। তদুপরি, মিথ্যাদৃষ্টি হল অপায়ভূমির বিভিন্ন বীজের বীজ তলা। (অপায় ভূমি হল দুঃখজনক অবস্থান, অথচ তৃষ্ণা সুগতি ভূমির সমুখানে বিঘ্নিত করে না)

দৃষ্টি, অবিদ্যা তৃষ্ণার থেকেও বেশী বিপদজনক ও ক্ষতি কারক কারণ অবিদ্যা তৃষ্ণার কর্মপদ্ধতির শ্রেণী বিন্যাস করা যায় না যা বিপদজনক অপায় ভূমিতে পতনের জন্য দায়ী। এই অবিদ্যার মূল উৎপাটন ও পরিত্যাগ করতে কেবল মাত্র তখনই সক্ষম হবেন যখন অরহত্ব মার্গ ফল লাভ করা যায়। অবশ্য তৃষ্ণাকে পরবর্তী নিম্ন স্তরেও মূল উৎপাটন করা যায়। এমন কি অবিদ্যা থাকলেও নিম্ন তিন স্তর সাক্ষাত করা সম্ভব।

দায়িকা বিশাখা পূর্বরাম বিহারের সুপরিচিতা দাত্রী স্রোতাপত্তি মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তার নাতির মৃত্যুতে শোকে মন আপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এরূপ দৌর্মনস্য এবং উপায়াস যা বিশাখার হয়েছিল তা অপায়গামী নয়। অর্থাৎ দৌর্মনস্য ও উপায়াস অপায়ভূমিতে পতন ঘটাতে পারে না।

## সাতি ভিক্ষু যিনি স্বাশত দৃষ্টিগ্রস্ত ছিলেন

সাতি ভিক্ষু নামক জাতকে আছে যে ভিক্ষু স্মৃতি ধারণা করতেন বিজ্ঞান, নিত্য, অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী কিন্তু কেবল মাত্র দেহ বদলায়। তিনি অন্য ভিক্ষুদেরকে বলতেন বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তাই শিক্ষা দিয়েছেন। দশটি জাতক যথা- তেমিয় জনক, সুবর্ণ, বিধুর, চন্দ্রকিনুর, ভুরিদত্ত, মহৌষধ, নিমিরাজ, নারদ ও বেশান্তর জাতক সম্পর্কে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি স্থির মনোভাব পোষন করেন যে জাতক সমূহ মতে তেমিয় হতে বেশান্তর পর্যন্ত দীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর যাত্রায় কেবল মাত্র দেহের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান এক অভিন্নরূপে জন্ম-জন্মান্তরে নিত্য পরিবর্তনহীন ও চিরস্থায়ী রয়েছে।

যে সব ভিক্ষু তাঁর সংস্পর্শে আসতেন তিনি তাদেরকে তাই প্রচার করতেন। মহান বুদ্ধের ঘোষিত সত্যধর্মের ব্যাপারে এধরণের অন্যায় বক্তব্য ভাল কিছু নয়। তিনি একগুঁয়ে ভাবে তার ভুল বিশ্বাস প্রচার করে বেড়াতেন। ভিক্ষুরা তাঁকে এরূপ আপত্তিজনক কাজ হতে বিরত করতে না পেরে বুদ্ধের নিকট গিয়ে সব কিছু খুলে বললেন। বুদ্ধ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন- “তুমি কি সত্যই এরূপ মিথ্যা ধারণা মনে পোষন কর? ভিক্ষু সাতি উত্তর দিলেন হাঁ বুদ্ধ। তাই তখন বুদ্ধ ভৎসনা করে বললেন মোঘ পুরুষ! তুমি কার নিকট শুনেছ আমি এরূপ ভুল তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছি? আমি কি কারণ বিনা ফল উৎপন্ন হয় না এরূপ দেশনা করিনি? আমি কি শিক্ষা দিইনি বিজ্ঞান অন্যান্য ধর্মের মত অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর এবং প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল প্রতি দুই মুহূর্তে একই রকম থাকে না (ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে)?

বুদ্ধ পুনরায় বিষয়টি উল্লেখ করে বললেন- ভিক্ষু যখন কোন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন বুঝতে হবে ইহা কোন কারণ বশতঃ

হয়েছে। বিষয় দ্বার ও আলম্বনের উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন চক্ষুর সহিত দর্শনীয় বস্তুর সংস্পর্শ ঘটে তখন চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে শ্রোত্র ও শব্দ, নাসিকা বা ঘ্রাণ, জিহ্বা ও রস, কায়, স্পর্শ, মন ও ভাব বা ধারাবাহিক ভাবে উৎপন্ন হয়। ইহা আগুনেরই অনুরূপ, জ্বালানির কারণেই আগুন প্রজ্বলিত হয়। কেবল মাত্র এই কারণ সক্রিয় হলেই ঐ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত আগুনকে কাষ্ঠাগ্নি, গোবর দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিকে গোবরাগ্নি, বাঁশ বা ঘাস দ্বারা অগ্নিও অনুরূপভাবে বলা হয়। একই ভাবে, একই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান, আলম্বন দ্বারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং ইহা হলে উহা হয়। ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি হয়। ইহার অবর্তমানে উহাও উৎপন্ন হয় না। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতু অনিয়মিত আপেক্ষিক, সংক্রান্ত বিষয়। বর্তমান জন্ম হল চ্যুতি বিজ্ঞানের নিষক্রিয় বা ক্ষান্ত অবস্থান এবং পরবর্তী জন্মে নতুন চেতনার উৎপত্তিকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বলা হয়। রাজকুমার তেমিয় এবং বিজ্ঞান মৃত্যুর কারণে ক্ষান্ত বা নিষক্রিয় হয়ে গেছে এবং নতুন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে বর্তমান অবস্থানে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান রূপে উপলব্ধি হয়েছে। অনুরূপভাবে রাজকুমার জনক, বিধুর, সুবর্ণ এবং বেসান্তর এর স্ব স্ব জন্মে নিষ্ক্রিয় হয়ে চ্যুতি বিজ্ঞান রূপে অবস্থান করে পরবর্তীতে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে নতুন ভাবে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান রূপ ধারণ করেছেন। চক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের সহিত সংযুক্ত।

জাতকে উল্লেখ আছে যে, একটি ব্যাঙ কোন কিছু না জেনে না বুঝে কেবল মাত্র সুমধুর সুর ও পরিষ্কার শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বুকের দেশনা শুনছিল। হঠাৎ রাখাল বালকের লাঠির অগ্রভাগের চাপে দৈবিক মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে দেবপুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝে নিতে

হবে যে তার চেতনা দেবপুত্রের শরীরকে অনুসরণ বা পশ্চাৎধাবন করেনি এবং দেবপুত্রের শরীরেও প্রবেশ করেনি। ইহা কেবল মাত্র আকস্মিক বা কার্য্য কারণ নীতি। বৌদ্ধ ধর্মে মৃত্যুর পরে আত্মা অন্য দেহে গমনের বিধান নেই। পুনঃ জন্মবাদ ও সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃত। প্রকৃত পক্ষে যা ঘটেছে তা হল দেবপুত্রের প্রতীসন্ধি বিজ্ঞান যা হল ব্যাধ এর পূর্ববর্তী জীবনের চ্যুতি চিত্তের অগ্রবর্তী কার্য্য-কারণের ফল। অন্য ভাবে বলা যায় ব্যাধ এর চ্যুতি চিত্তের উপর নির্ভর করে দেবপুত্রের প্রতীসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ ভাবে ধারণা থাকতে হবে যে দেবপুত্রের ও ব্যাধ এর বিজ্ঞান বা চিত্ত এক নয় এবং অনুরূপও নয়। যেহেতু আত্মা অনিত্য বা বিজ্ঞান অনিত্য তাই উভয়ে এক অবস্থান হতে অন্য অবস্থানে সম্মিলিত হয়েছে। কোন আত্মা বা চেতনা একে অন্যের নিকট গমনাগমন করে না। পূর্বেই বলা হয়েছে সবকিছুই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর এবং পর্যায়ক্রমে দুই চিত্ত এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

একই ভাবে- শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ দাত্রী পূর্বারামের প্রতিষ্ঠাতা পূণ্যবতী বিশাখা দেহত্যাগের পর তুষিত দেবরাজ এর রাণী সুনিমিত্ত নামে দেবলোকে উৎপন্ন হন। এখানেও একইভাবে উপরোক্ত জাতক মোতাবেক সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায় দায়ীকা বিশাখার চেতনা বা বিজ্ঞান কখনও তুষিত দেবরাজের স্ত্রী সুনিমিত্তার দিব্য শরীরের অনুসরণ নেয়নি তথাপি নতুন লোকে প্রতীসন্ধি চিত্তের উৎপত্তির হেতু হল বিশাখার অগ্রবর্তীর চ্যুতি চিত্ত তা বিজ্ঞানের কারণে- যার পরিণাম ফল- জন্ম বা জাতি। অবশ্য নতুন ভাবে বর্ণনা করার কিছু নাই যে এক লোক হতে অন্য লোকে কিছুই গমনাগমন করে না। ইহা কেবল মাত্র কার্য্য কারণ নীতির পরিণাম ফল।

যখনই ভ্রান্ত বিশ্বাস, বিবেচনা বা ভুল করা হয় যে ইহলোকের চেতনা বা বিজ্ঞান আর পরলোকের চেতনা বা

বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন- এই দৃষ্টিকে স্বাশত দৃষ্টি বলা হয়। আর যদি ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ মনে করে থাকে যে মৃত্যুর পর কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া নেই- তাকে উচ্ছেদ দৃষ্টি বলে। কেবল মাত্র মধ্য পথই দুটি চরম পন্থা থেকে মুক্ত যাহা মার্গ বা ফল প্রাপ্তির নেত্রীত্ব দিয়ে থাকে। যেখানে দৃষ্টির বাধা বিগ্নতা বিদ্যমান সেখানে মার্গ ফল প্রাপ্তি কখনও সম্ভব নয়। এমন কি বিপুল উদ্যোগ নিয়ে বিদর্শন অনুশীলন করে প্রথম স্তর স্রোতাপত্তি মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারা যায় না।

-----○-----

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### বিদর্শন ভাবনা

সতিপট্ঠান সুত্ত্ত বৌদ্ধ অনুশাসনে চির সুপরিচিত। সতিপট্ঠান সুত্তে চারটি বিভাগ যাকে প্যাগোডার চারটি ধাপযুক্ত সিড়ির সহিত তুলনা করা যায়। যতটা ধাপ অতিক্রম করা যাবে ততটা প্যাগোডার চত্বরের নিকটবর্তী হওয়া যাবে।

কায়ানুপস্সনা- রূপ- উদয় বিলয় ধর্মী রূপ সমূহকে স্মৃতি অনুশীলন করা। (রূপ স্কন্ধ)

বেদনানুপস্সনা- ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যানুভূতি সমূহের উদয়-বিলয় স্মৃতি অনুশীলন করা। (বেদনা স্কন্ধ)

চিত্তানুপস্সনা- উৎপন্ন চিত্তের উদয়-বিলয়কে স্মৃতি অনুশীলন করা। (বিজ্ঞান স্কন্ধ)

ধম্মানুপস্সনা- সচ্চ বা সত্য বিষয়ে স্মৃতি অনুশীলন করা। উৎপন্ন ধর্ম সমূহকে উদয়-বিলয় স্মৃতি অনুশীলন করা। (সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধ)

স্মরণ রাখা প্রয়োজন কায়ানুপস্সনা ভাবনা করার সময় অবশিষ্ট তিন অনুপস্সনাকে বর্জন করা যায় না। কেবলমাত্র অগ্রগণ্যতা বা প্রবণতা বা গুরুত্ব প্রদান করার উপর পার্থক্য নির্ভর করে। জেনে রাখা প্রয়োজন সতিপট্ঠান সূত্রের অন্তর্গত পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে এমন একটি বাক্য পরিলক্ষিত হয় যথা- সমুদয় ধম্মানুপস্সী বিহরতি, বয় ধম্মানুপস্সী বিহরতি, সমুদয় বয় ধম্মানুপস্সী বিহরতি। এই তিনটি বিষয় বিদর্শন ভাবনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই তিনটি বিষয় গভীর স্মৃতি সহকারে অনুদর্শন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভাবেই বিদর্শন স্তরে পৌঁছে স্মৃতির কোন উন্নতি হবে না। সাধারণত যোগীদের একাগ্রতা ও সম্যক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও স্মৃতি অনুশীলন প্রক্রিয়ার যাত্রা পথ (সমাধি) বাধাগ্রস্ত হবে। কাজেই উক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধি রচনায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রয়োজনীয়।

একই সূত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে পরিলক্ষিত হয়। অথি কায়োতি বা পনস্স সতি পচুপট্ঠিতা হোতি। “দেহ আছে” তার এই স্মৃতি সমুপস্থিত হয়। উহা জ্ঞান ও প্রতিস্মরণের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার অর্থ সাধকগণ আশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আরো একাগ্র ও স্মৃতিমান হওয়া। আর একটি বাক্য সেখানে দেখা যায়, “যাবদেব এগণ-মত্তায় পটিস্সতি মত্তায় অনিস্সিতো চ বিহরতি।” অর্থাৎ তিনি (বিষয় বাসনার অনধীন বা অধীন না হয়ে অবস্থান করেন) এই নির্দিষ্ট স্থানে এসে যোগী বিদর্শন স্তরের উপনীত হন। সুতরাং কায়, বেদনা, চিন্তা ও ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না এমন কি “আমি স্মৃতিঅনুশীলন করছি” তাও মনে করেন না। ইহা আমি, যিনি স্মৃতি করে অথবা একাগ্রতা খুবই ভাল। আনাপানের প্রতি আমার অনুধ্যান খুবই সন্তোষজনক। এরূপ কোন কিছুর প্রতি আসক্তি উৎপাদন করেন না। কায়, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, আমি, আমার কায়,



আমার বেদনা, আমার চিন্তা জগতের এরূপ কোন বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করেন না। এবম্পি খো ভিক্ষবে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপসসী বিহরতি। এরূপেও তিনি (ভিক্ষু) কায় বিষয়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ইহার অর্থ যোগী সত্য সত্যই কায়ানুপসসনা ভাবনা রত থাকেন।

বর্তমান দিনের বিদর্শন ধ্যানকে নিবিড় ও সতর্ক ভাবে অনুসন্ধান করে পক্ষপাতহীন ভাবে বলা যায় বেশীর ভাগ যোগী কেবল মাত্র অর্ধপথ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। কারণ সাধারণত সতিপট্ঠান সূত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তুকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মর্ম বস্তু “সমুদয় বয় ধম্মানুপসসী বিহরতী।” -তিনি দেহের উৎপত্তি বিনাশ কিংবা তদুভয় প্রকৃতি দেখিয়া অবস্থান করেন।

### স্মৃতি উপস্থাপন বা সতিপট্ঠান

মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ সতিপট্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন-

১। সতিপট্ঠান- কায়, চিন্তা, বেদনা ধর্মের প্রতি স্মৃতি উপস্থাপন করা।

২। সতিপট্ঠান ভাবনা- উক্ত বিষয়ে স্মৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে উদয়-বিলয় জ্ঞান অর্জন করা।

৩। সতিপট্ঠান গামিনি প্রতিপদা- অগ্রবর্তী পথ যার দ্বারা সংস্কার ধর্ম সমূহের ত্রিলক্ষণ জ্ঞান পরিপক্বতায় অসংস্কৃত হয়ে নিবৃত্ত হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা :-

১। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর স্মৃতি উপস্থাপন করা বা আশ্বাস-প্রশ্বাসের একাত্মতায় উৎপন্ন যেকোন একটি বিষয়ে স্মৃতি ও উপস্থাপন করাই হল সতিপট্ঠান। মনে রাখা প্রয়োজন

অনিত্যতা দর্শনে উদয়-বিলয় জ্ঞান অনিত্যের প্রতি বিরক্তিকর বোধে নির্বেদ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনিত্য পরিসমাপ্তি হওয়া মার্গ জ্ঞান। ফল জ্ঞানে অসংস্কৃত নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করে।

২। রূপ, বেদনা, চিত্ত বা ধর্ম বিষয়ে গভীর ভাবে স্মৃতি মগ্ন হওয়া এবং তাদের উৎপত্তি ও মূহূর্তমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হওয়া (সমুদয় বয় ধর্মানুপস্বসী বিহরতি)।

৩। দৃষ্টি বিষয়ভূক্ত বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন স্ফোর উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্তি এবং তাদের প্রতি বিরাগকে বলে সতিপট্ঠান গামিনি প্রতিপদা। ইহাই সংস্কার বা উৎপত্তি বিনাশ রুদ্ধ ও সমাপ্তির পথে পরিচালিত করে। মনে রাখতে হবে অনুস্মৃতি সমর্থ পর্যায়ভূক্ত, কিন্তু অনুপস্বসনা বিদর্শন। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ফোরসমূহের উদয়-বিলয় সংক্রান্ত অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম জ্ঞান উৎপন্ন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বিদর্শন তুল্য হবে না।

মহান বুদ্ধ সুসীমা পরিব্রাজককে বলেছিলেন- সুসীমা, সমাধির কারণে নয় কেবলমাত্র বিদর্শনের কারণেই সেই মার্গ ও ফল হৃদয়ঙ্গম ও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিদর্শনই নিজস্ব গুণধর্মের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ঈম্পিত ফল যার দ্বারা মার্গ ও ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বলিলেন- “Pubbhecho- হে সুসুমা যথাভূতঞাণং (তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন জ্ঞান যা জীব জগতে প্রতিনিয়ত উদয়-বিলয় হচ্ছে) প্রথম অর্জন করে তারপরে নির্বাণধর্ম অনুসরণ করতে হবে। অন্য ভাবে বলা যায় যোগীগণ জ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে প্রথমে অনুভব করে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের উৎপত্তি কিছুই নয় কেবল মাত্র দুঃখসমুদয় এবং দ্বিতীয়ত তাদের উৎপত্তিতে জ্ঞাত হয় যে সম্বন্ধযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ অপ্রীতিকর, বিরক্তি জনক এবং সম্পূর্ণ রূপে অনাকাঙ্ক্ষিত অবাঞ্ছিত।

বুদ্ধ স্পষ্ট ভাবে বলেছেন- সম্যকদৃষ্টি দুটি অবস্থায় চূড়ান্ত আলোকপ্রাপ্তি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যদিও বা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে শিক্ষা দিয়েছেন প্রজ্ঞার তিন অবস্থান থেকে যথা সচ্চ এণ্ডঞানং (সত্য জ্ঞান), কিচ্চ এণ্ডঞানং (কৃত্য জ্ঞান) এবং কতএণ্ডঞানং (কৃত জ্ঞান) আলোকিত হওয়া সম্ভব।<sup>১</sup>

সুতরাং যোগীদের বলা যাচ্ছে দীর্ঘ বিরক্তিকর পথ পরিহার করে সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করার যা বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন।

-----○-----

## ষষ্ঠদশ অধ্যায়

### চিন্তানুপস্সনার গুরুত্ব

প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ মানবের হিতের জন্য চিন্তানুপস্সনা ভাবনা বিষদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইহার গুরুত্ব সীমাহীন।

পিটকের পালি অর্থকথা খুঁজে দেখা যায় অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রথম নিপাত “অকম্মনিয় বর্গে” নিম্নরূপ চিন্তানুপস্সনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। ভিক্ষুগণ এমন কোন চিন্তা দেখি না স্মৃতি উপস্থাপন যে চিন্তা উৎকর্ষ সাধনে সহজ। চিন্তানুপস্সনার প্রচেষ্টার অভাবে চিন্তা অদম্য বলিয়া আমি দেশনা করি।

---

<sup>১</sup>। বুদ্ধের পুনঃ জন্ম সংক্রান্ত তত্ত্বগত শিক্ষা পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে হবে যে আত্মার দেহান্ত গমন অথবা পুনঃজন্ম প্রাপ্তি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। কারণ ঈশ্বর তৈরী চিরস্থায়ী আত্মার দেহান্ত গমন অথবা ব্রহ্মা হতে প্রবাহিত আত্মাকে অনাত্মাধর্মী বলেছেন।

২। এমন কোন চিত্ত দেখি না স্মৃতি উপস্থাপনের দ্বারা যে চিত্ত উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ অন্য কোন প্রচেষ্টার কারণে যে অদম্য চিত্তকে দমন করা সহজতর।

৩। ভিক্ষুগণ, আমি এমন কোন চিত্ত দেখি না যা স্মৃতি উপস্থাপনের দ্বারা পরিমার্জিত ও বিকশিতমনের মহৎ লাভ ও উপকার করতে সক্ষম।

৪। বুদ্ধ বলেছেন- আমি এমন কোন ধর্ম দেখি না যা পরিমার্জিত ও বিকশিত মনের এত হিতকর।

৫। বুদ্ধ আরো বলেছেন- আমি এমন কোন ধর্ম দেখি না যে ধর্ম পরিমার্জিত ও বিকশিত মনকে এত আনন্দ ও সৌভাগ্য দান করতে পারে।

বুঝতে হবে যে অপরিমার্জিত/অংস্কৃত ও অবিকশিত মন বিপরীত ফলই বহন করে।

বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন-

মনোপুষ্কংগমা ধম্ম মনোসেট্ঠা মনোময়া,  
মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,  
ততো নং দুক্কমম্বেতি চক্কং বা বহতো পদং।

বঙ্গার্থ- মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান এবং ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে, তবে শকটবাহীর (বলদ) পদানুগামী চক্রের ন্যায় দুঃখ তার অনুসরণ করে।

মন সমস্ত কার্যক্রমের অগ্রদূত এবং সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের পূর্বগামী। মন বা চিত্তের সহযোগিতা এবং সমবায় ছাড়া কোন কাজই সম্ভব নয়। কুশল অকুশল সব কাজেই মন মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কোন কর্ম করার আগে মন সে সম্পর্কে পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, নতুবা তা সম্ভব নয়। যদি

আমরা চিন্তকে সংযত করি তবে আমাদের দেহও সংযত থাকে। যখন আমাদের মন উন্মুক্ত ও অসংযত থাকে তখন আমাদের কায় কর্ম বা শারীরিক ক্রিয়া কর্ম অদমিত, অসংযত অবস্থায় চিন্তা চেতনায় ভাবভঙ্গী প্রকাশে সেচ্চাচারিতার সীমা থাকে না। সুতরাং মনই কেন্দ্রীয় শক্তি বা মূল যা আমাদের সমস্ত চিন্তা-চেতনা জনিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

মনেই অহংবোধ বা আমি, আমার ব্যক্তিত্ব এধরণের মন মানসিকতা বেশীর ভাগ বিরাজ করে যা সৎকায় দৃষ্টির সুতিকাগার স্বরূপ। আমি অহং প্রবঞ্চনার চালিকা শক্তি হল মন বা চিন্ত। অতএব কায়িক, বাচনিক, মানসিক যত ক্রিয়া কাণ্ডই ঘটুক না কেন তা মনেরই নির্দিষ্ট পরিণাম ফল। মনে রাখা দরকার ব্যক্তিত্ব বা অহংবোধ বা সৎকায় দৃষ্টি মৌলিক উপাদান হল মন যা ধুম্রজাল সৃষ্টি করে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অনুপস্সনা দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়-

“দিট্ঠি চরিতস্সপি মনদস্স নাতিপ্পতেদ গতং

চিত্তানুপস্সনা সতিপট্ঠনা বিসুদ্দি মল্লো।”

ইহার অর্থ এই যে, যোগীদের দৃষ্টির প্রতি প্রবনতা রয়েছে, এবং যাদের বোধশক্তি নিষ্প্রভ, ভোঁতা, সরল তারাও অপরিমিতভাবে সুপ্রণালীতে বিবৃত তারও চিত্তানুপস্সনা অনুশীলন করে তাদের পক্ষেও মার্গ উপলব্ধি করা সহজতর। পালি পিটকে ভূতপত্তি সম্পন্ন প্রয়াত মোগোক্ ছেয়াদ পিটক এর বিধি বিধান সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে ইহা পিটক ও টিকা/ভাষ্য এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা বর্তমান যোগীদের ক্ষেত্রে অনুশীলনের খুবই উপযোগী পন্থা। যদিও চিত্তানুপস্সনা ভাবানাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে- কিন্তু ইহা বলা যাবে না যে অবশিষ্ট অনুপস্সনাকে উপেক্ষা বা বাতিল করা হয়েছে। না এধরণের কিছুই নয়, কারণ ইহা শরবতের মত-

যথা- কাগজী লেবুর সদ্য রসের সহিত যেমন চিনি, লবন ও জল এসব মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণ অনুরূপ ভাবে যখন চিত্তানুপস্ফুটনা অন্তর্ভুক্ত থাকে যদিও বা তার প্রথমটির মত প্রধান্যসম্পন্ন ও প্রগাঢ় নয়। তারাই সম্প্রযুক্ত ধর্ম, তারা সহঅবস্থানকারী, সমন্বীত হয়ে একই সময়ে উদয়-বিলয়, কার্যক্রম সংগঠিত করে।

সতিপট্ঠান সূত্র প্রসঙ্গে “Sacittapariaya Sutta,” মহা সারিপুত্র মহাথের বলেছিলেন অপরের মনের গতিবিধি বুঝা খুব একটা সহজ নয়। কারণ তা ভুলও হতে পারে শুদ্ধও হতে পারে। কিন্তু নিজের মনকে বুঝা অর্থাৎ নিজের মনে কি উৎপন্ন হচ্ছে তা অনুধাবন করা খুবই সহজ। অনুশীলনকারীদের উচিত নিজের মনকে নিরক্ষণ করা যা করা খুবই সহজ কিন্তু একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। মনে করুন আপনার মনে লোভ চিত্ত উৎপন্ন হল, সহজেই আপনি বুঝতে পারলেন আপনার মনেও লোভ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে। যদি দ্বেষ চিত্ত, মোহ চিত্ত বা ঈর্ষা, মাৎসর্য আপনার মনে উৎপন্ন হয় সাথে সাথেই জানতে পারলেন ইহা উৎপন্ন হচ্ছে এবং যদি বিলয় হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন বিলয় হচ্ছে।

বলা হতে পারে যে মায়ানমারের বহু বার্মিজ বৌদ্ধ ভুল ধারণা বশতঃ বিকৃত মনোভাব পোষন করে যে বিজ্ঞান ইহলোক থেকে অন্য লোকে দেহান্তর গমন বা মানব দেহ পুনঃ ধারণ করে। আরও বলা যায় বেশীর ভাগ জনগণ বিশ্বাস করে যে আত্মা অবিনশ্বর। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর আত্মা মৃত দেহ ত্যাগ করে। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত যদি কোন ফাঁক জায়গা বা অভিনিবেশের অভাব থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মা দেহ ত্যাগ না করে মশার লাভার মত কীট হয়ে বুলন্ত অবস্থায় আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এধরনের ভ্রান্ত ধারণার শিখর খুব গভীরে পুথিত যা সহজেই নিবৃত্ত হয় না। ইহলোক

হতে পরলোকে আত্মার মানব দেহে গমনাগমন এবং মানব দেহ ধারণা মিথ্যা দৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়। উপরে বর্ণিত এধরণের ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধ পরিকর ভাবে মনে পোষণ করার কারণ হল তাদের বিশ্বাস বিজ্ঞান স্থায়ী এবং অক্ষুন্ন থাকে কেবল মাত্র দেহ পচনশীল।

তারা এখনো প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে না পারার কারণে অনুধাবন করতে পারছে না যে “বিজ্ঞান অনিত্য” এবং আদি অন্তহীন প্রক্রিয়ায় উৎপত্তি বিনাশ ধর্মের আওতাধীন। ইহা একই সময়ে একই জায়গায় উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু উৎপত্তি স্থান থেকে এক ইঞ্চিও নড়তে পারে না। যেখানেই উৎপন্ন হয় অনুক্রমিক পর পর দুই মুহূর্তের (সেকেণ্ডের) জন্য একই রকম থাকে না।

মহাথের এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধ জনসাধারণের গভীর মর্ম মূলে পৃথিত বিজ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার মূল উৎপাটন করার জন্য চিত্তানুপস্‌সনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।<sup>১</sup>

-----○-----

---

<sup>১</sup>। প্রয়াত মহাথের মোগক্ ছেয়াদ জনসাধারণকে বড় ধরনের ক্ষতি ও তাদেরকে বিনিপাতিক প্রেত ভয় হতে উদ্ধার করার জন্য মিথ্যাদৃষ্টিকে বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। স্রোতাপত্তির প্রথম স্তর লাভ করার জন্য দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেদন করা প্রয়োজন। সাধারণত দৃষ্টি চিত্ত বা মনে বাস করে এবং অনুরক্ত/আসক্ত থাকে। এজন্য চিত্তানুপস্‌সনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

## সপ্তদশ অধ্যায়

### কিভাবে মিথ্যাদৃষ্টি বর্জন করা যায়

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বলেছেন অপায় গতিতে পতনের মূল কারণ দৃষ্টিকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। স্পষ্টত যারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন তারা প্রাণী হত্যা, চুরি, যৌন ব্যভিচার, মাতৃ-পিতৃ হত্যা, এমন কি মহৎ পাপ-বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত ঘটায় ও বিবেক যন্ত্রণা ভোগ করে না। এজন্য বলা যায় সব ধরনের ভুল ও গর্হিতকর কাজ কেবল মাত্র মিথ্যাদৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, অপায় গতিতে পতন হতে রক্ষা পেতে হলে তার মূল কারণকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করতে হবে।

বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষ মনে করে অকুশল কর্মই অপায় গতির (কষ্টকর দুঃখ জনক অবস্থান) জন্য দায়ী। কিন্তু বিশদ ভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ হয়েছে যে মিথ্যাদৃষ্টিই প্রকৃত এবং প্রধান আসামী। সন্দেহ নাই জন্মাদ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর শিরচ্ছেদ করলেও কিন্তু তার ক্ষমতা সীমিত। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের বা জজের হাতে, যিনি রায় প্রদান করেছেন।

অনুরূপ ভাবে মিথ্যাদৃষ্টিই সচেতন প্রাণীকে অপায় গতিতে তাড়ায়ে নিয়ে যায়।

যে কর্ম আমাদেরকে অপায়ে নিক্ষেপ করে সে কিন্তু প্রকৃত অপরাধী নয়। দৃষ্টিই প্রকৃত অনিষ্টকারী ও ক্ষতিকারক। যে দৃষ্টির মূল কারণ বলা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হল।

খাওয়ার ইচ্ছা, ঘুমানোর ইচ্ছা, কথা বলার ইচ্ছা, এসব ধরনের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় কেবল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা যথা- আমি খেতে চাই, আমি ঘুমাতে চাই, আমি কথা বলতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি মানসিক দৃশ্য উৎপন্ন হওয়ার কারণে ব্যক্তিত্ব, অহংবোধ, আমি, আমার এ ধারণার ভুল ধারণার



জন্মও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম মন দ্বারের সহিত সংঘর্ষ বা দৃঢ়তার কারণে চিত্ত চেতনা উৎপন্ন হয়। এভাবেই ব্যক্তি, আমি, অহংবোধ, আমার ইত্যাদি কল্পনা করা হয়। সুতরাং দেখিতেছে কে- আমি দেখি, শুনিতেছে কে- আমিই শুনি এই ধরণের ভুল ধারণা হতে সতর্ক থাকতে হবে। দেখার, শুন্য, করার কোন ব্যক্তি নাই। ইহা কেবল মাত্র কার্য-কারণ নীতির স্বাভাবিক ফল। যখন দ্বেষ চিত্ত, মোহ চিত্ত উৎপন্ন হয়- তাদের কে বুঝতে হবে। নিরক্ষণ করতে হবে এবং জ্ঞাত হতে হবে যে ইহা দ্বেষ চিত্ত, লোভ চিত্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে ইহারা কেবল নিজস্ব সত্ত্ব ও ব্যবহারিক পদ্ধতি অনুসারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিছুদিন অনুশীলন করার পর যোগীদের ধারণা হবে যে এসব কিছু অহংবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় গুরুত্ব দিতে হবে যে মানসিক পরিস্থিতি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সে কারণে চেতনা ছাড়া আর কিছুই নেই। এজন্য সেখানে আমি, অহং, আমার, আমাদের বলে কিছুই নেই।

আবার সেখানে হিংসা অথবা ভিক্ষা দান করা, ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে। চিন্তা চেতনা যাই উৎপন্ন হোক না কেন বুঝে নিতে হবে যে এসব কিছু মানসিক অবস্থা মাত্র। যখনই ধূমপান করা ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তখন জ্ঞাত থাকতে হবে ইহা আমার ইচ্ছা নহে চিন্তা চেতনাই ধূমপান করতে ইচ্ছুক। এসব কিছু উপভোগও কার্যক্রম নীতি নিয়মে উৎপন্ন হচ্ছে মাত্র। অন্য কিছুই নয়, যার দ্বারা আমি বা অহংরূপে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্যই মানসিক ভাবে স্মরণ রাখতে হবে দুটি- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বস্তুর ধারাবাহিক পরিণাম ফলের কারণে চেতনার উৎপত্তি যা নিম্নলিখিত ভাবে বুঝে নিতে হবে।

যখন শ্বাস নেওয়ার চিত্ত জাগে তাকে মনে মনে সে ভাবে জানতে হবে এবং শ্বাস ত্যাগ করার চিন্তা উৎপন্ন তখন তাকে নীরবে স্মৃতি সহকারে জানতে হবে। আশ্বাস প্রশ্বাস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বিষয় বস্তু ধারাবাহিক কার্যক্রমের পরিণাম ফল। ওখানে আমি, তুমি, সে, অহং বলতে কেউ নেই যারা শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে বেশীর ভাগ যোগী ভুল অভিমত পোষন করে যে আমি শ্বাস নিচ্ছি, আমি শ্বাস ত্যাগ করছি। এ ধরনের ভ্রান্তির কারণে তারা আনাপানা স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। যখন ব্যক্তি অহং, আমি, আমিহু মনোবৃত্তি কিছু কিছু দূরীভূত হয় তাতে সংকায় দৃষ্টিও সমসাময়িক ভাবে কিছু কিছু মন থেকে অপসারিত হবে। সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রগাঢ় ধ্যানানুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী উপাদান উচ্ছেদ করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মিথ্যাদৃষ্টি, উচ্ছেদ এর কারণে সমাধি কার্যক্রম মনকে একটি বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীভূত করে নেত্রীত্ব দানকারী সম্যকদৃষ্টিকে সহায়তা করে থাকে।

মনের একাগ্রতা বা সম্যক সমাধির নেত্রীত্বে ধ্যানে মনোনিবেশের প্রয়োজন নেই। সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধির অনুপ্রেরণায় সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প ধ্যানে মনোনিবেশের ব্যবস্থা করবে।

যখন তুমি, আমি, আমার অহং বোধ উপস্থিত হয় তখন সংকায় দৃষ্টি সক্রিয় থাকে। সে যাই হোক যখন চেতনা, বা সংস্কার উৎপন্ন হয় তখন ধারণা করতে হবে যে ইহা চেতনা, আমি, তুমি, সে, অহং নহে। অনুরূপ ভাবে ইহা বেদনা- আমি বা অহং নহে, ইহা সংস্কার আমি, তুমি, নহে। যখন যোগী এই স্তরে পৌঁছবেন তখন সংকায় দৃষ্টি সাময়িক ভাবে দূরীভূত হবে। বর্ণনা মোতাবেক অনুশীলন করা এত সহজ নয়। বিষয় বস্তুর উপর গভীর স্মৃতিমান হওয়া সত্ত্বেও এমন বহু বিষয় রয়েছে যা যোগীদের স্মৃতি থেকে পালিয়ে যেতে পারে। স্মৃতি থেকে যত

বেশী কিছু পালাতে সক্ষম হবে মিথ্যাদৃষ্টিকে দূরীভূত করা ততই বিলম্বিত হবে।

স্মৃতি বাধাবিহীন করার, জ্ঞানকে স্পষ্ট ভাবে বোধগম্য করার এবং অল্প সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির এমন কোন উপায় কি আছে? যোগীকে তাঁর স্কন্ধ সম্পর্কে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে সংস্কারকে গভীর ভাবে নিরক্ষণ করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে তারা একের পর এক পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন হচ্ছে এবং ইহা ধাবিত বিষয় বা অনুক্রম এর কারণেই উৎপন্ন হচ্ছে।

ইহাকে বলা হয় দৃষ্টি উচ্ছেদের একাগ্রতা কিন্তু অনুপস্সনা নয় যার দ্বারা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা অর্থাৎ স্কন্ধ সমূহের উদয় বিলয়ের প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হবে।

এই স্তরকে নাম-পরিচ্ছেদ জ্ঞান বলে। সম্পূর্ণ ভাবে এই প্রক্রিয়া অনুধাবন করার পর আরো উচ্চ স্তরের জন্য কাজ আরম্ভ করতে হবে। ইহা কে অনুপস্সনা বলে যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

-----○-----

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### শ্বাশত দৃষ্টি, উচ্ছেদ দৃষ্টি, সংকায় দৃষ্টি ছেদনের উপায়

মানুষ যখন তৈরী করা উপাদেয় খাদ্য খাবার টেবিলের উপর দেখে তখন খাবার তৃষ্ণা জাগে। তখন আবার কর্মভব এর (শারীরিক প্রতিক্রিয়ার) প্রভাবে, খাওয়ার জন্য প্রচুর অভিপ্রায় জাগে। অন্যভাবে বলা যায় তৃষ্ণা উপাদানকে প্রভাবিত করে এবং উপাদান কর্মভবের অনুসরণ করে। এই ভাবে তৃষ্ণা, উপাদান এবং কর্মভব তিন উপাদান সম্বলিত ভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

মহান বুদ্ধ বলেছেন তন্থা পচ্চয় উপাদান। ইহার অর্থ তৃষ্ণা ও উপাদান উভয়ের মধ্যে পচ্চয় (হেতু বা নির্ভরশীলতা) রয়েছে। যদি সেখানে পচ্চয় বা হেতু বা কারণ না থাকত তবে তাতে কোন কর্মফল হত না। সেই কারণে তৃষ্ণা বা উপাদানও থাকত না।

আবার পরবর্তী সংযুক্তিতে উপাদান পচ্চয় কর্মভব। অর্থাৎ স্পষ্টত দেখা যায় উপাদানের নির্ভরশীল না হয়ে কর্মভব সক্রিয় হতে পারে নি। কেবল উপাদান উৎপন্ন হয়নি তা নয়- ইহা আবার পরবর্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় উৎপত্তির জন্য প্রত্যয়কে ত্যাগ করে নিচ্ছিল হয়েও গেছে। ইহা স্পষ্ট করে বলা যায় প্রত্যয় বা হেতু হল অভাবিত পূর্ব অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম।

সমস্ত সচেতন প্রাণী দুঃখজনক অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম তৃষ্ণা, উপাদান, কর্মভব এর কারণে ঘূর্ণিচক্রে আবর্তমান। আমাদের উচিত প্রতীত্যসমুৎপাদে যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সে ভাবে আমাদের মধ্যে কি সংঘটিত হচ্ছে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত।

তন্থা পচ্চয় উপাদান ক্ষেত্রে তৃষ্ণা ও উপাদানের মধ্যখানে প্রত্যয়কে পৃথক উৎপাদক হিসাবে গণ্য করা যাবে না কিন্তু তৃষ্ণা হেতু উপাদানের উৎপত্তি যা প্রত্যয় হেতুকে ত্যাগ করে উপাদানের উৎপত্তির জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্য তন্থা পচ্চয় উপাদান। যদি প্রশ্ন করা হয় উপাদান কেন উৎপন্ন হয়? তৃষ্ণা কি নিজেই বা তৃষ্ণার কারণে উৎপন্ন হয়?

এই অবস্থায় যোগীদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে তৃষ্ণার কারণেই উপাদানের উৎপত্তি। এই বাক্যাংশটুকু যোগীদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা চিন্তা করতে হবে যাতে তারা নির্ভরশীল উৎপত্তি নীতিজ্ঞান উৎপন্ন করে যেন বুঝতে পারে যে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বস্তু সমূহ নিজে, দৈবক্রমে আকস্মিক

ভাবে বা নিছক সুযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয়ে থাকে এরূপ কল্পনা বা ধারণা যেন ত্যাগ করতে পারে। প্রবর্তীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বস্তু উপাদান উৎপত্তির পথ উদ্ঘাটন করে। এই ক্ষেত্রে তৃষ্ণাই উপাদান উৎপত্তির পথ প্রসঙ্গ করেছে। সুতরাং পচয় তন্হা বা তৃষ্ণা হেতু উপাদান উৎপত্তির কারণ। এই অবস্থা যোগীদের উচিত বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা।

শৃঙ্খল সংযুক্তির কারণ সমূহ যদি পরিষ্কার ভাবে যোগীদের বোধগম্য হয় তবে নির্ভরশীল উৎপাদন নীতি সম্পূর্ণ বোধগম্য হবে এবং তদুপরি বর্তমান স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন অনুক্রমের ফল হল অতীত স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন অনুক্রমে যেখানে অতীতের সহিত বর্তমানের শৃঙ্খল সংযোগ এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংযোগ সাধিত হয়। যদি কেউ নাছোড়বান্দার মত অটল ভাবে বিশ্বাস করে যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোন সংযোগ নেই তবে মনে করতে হবে সে ধ্বংসকারী ভ্রান্ত ধারণা উচ্ছেদ দৃষ্টিতে নিমগ্ন। এধরণের ভ্রান্ত ধারণা স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

আবার খাওয়ার জন্য তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তখন প্রবল ইচ্ছা বা আসক্তি পশ্চাৎ ধাবিত হয় এবং সেই আসক্তি কায়কর্ম এবং বাক্য কর্ম প্রভাবে মানুষ বলে আমি ক্ষুধার্থ, আমি আমার খাদ্য কিনে খাব। এইভাবে নির্ভরশীল উৎপত্তি নীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রথমে খাবার জন্য তৃষ্ণা জাগে এবং সেই ইচ্ছা “পচয়” ত্যাগ করে নিচ্ছিন্ন হয়ে খাওয়া হেতু উপাদান এর উৎপত্তি। অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে পচয় এর কার্য-কারণ হেতু কেবল উপাদান উৎপন্ন করে যা তৃষ্ণা ও উপাদানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। আবার প্রত্যয় কে রেখে উপাদান নিচ্ছিন্ন হয়ে কর্মভব উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাতে পরিলক্ষিত হয় যে ইহাই বিজ্ঞান বা চেতনার কার্যক্রম শৃঙ্খল। যোগীদের যখন ইহা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয় কেবল উৎপন্ন হবে না নিচ্ছিন্ন হয়ে

নতুনকে জায়গা করে দেবে। এই অবস্থায় যোগী শ্বাশত দৃষ্টির বেড়ি মুক্ত হবেন।

যোগীর পরবর্তী পদক্ষেপ হল বিজ্ঞানের উদয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রকৃত পক্ষে ইহা কি বিজ্ঞান, না কেবল মাত্র নিছক চিন্তা যার মধ্যে আমি, ব্যক্তি বা অহংবোধ নাই? স্বাভাবিক ভাবে লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং সব রকম আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হতে পারে। যখন এ সমস্ত কিছু উৎপন্ন হবে তখন অবশ্যই যোগীকে মনে মনে উপলব্ধি করে জেনে চিহ্নিত করতে হবে যে ইহা কেবল চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে রকম চেতনাই জাগ্রক না কেন যোগীকে মনোযোগ দিতে হবে এবং স্বজ্ঞানে প্রত্যেকটি চেতনার উদয় জ্ঞান জেনে জেনে ধারণা করতে হবে যে ইহা কেবল মাত্র মানসিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ওখানে আমি, আমার, অহং ও ব্যক্তি রূপে প্রকাশ করার কিছুই নেই। যখন চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন অবগত হতে হবে, যে দেখছে সে আমি নহি কারণ দেখার কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই। যখন শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সে ক্ষেত্রেও সচেতন জ্ঞানে বুঝতে হবে যে শুনছে সে আমি নহি, কারণ শুনার জন্য কোন নির্দিষ্ট সত্ত্বা নাই, কেবল শ্রবণ চিত্ত মাত্র। তাই ওখানে অহং, আমি, আমার, ব্যক্তি রূপে প্রকাশ করার কিছুই নেই।

যখন যোগী দেখেন তখন তিনি মনে করেন যে দেখতেছেন তিনিই “সে”। এই বিশ্বাস বা ধারণাকে সৎকায় দৃষ্টি বলে।

সাধক যখন মনে মনে উপলব্ধি করে জ্ঞাত হন যে তিনি যা দেখেন তা কেবল মাত্র চক্ষু বিজ্ঞান, বিজ্ঞান স্কন্ধ যার দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। এরূপ হলে কেবল মাত্র সৎকায় কিন্তু দৃষ্টি নয়। সৎকায় অর্থ পঞ্চ পুঞ্জীভূত স্কন্ধ গঠনে সহায়তাকারী উপাদান। আমি, স্বতন্ত্রবোধ, অথবা ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা হল দৃষ্টি। উপমা স্বরূপ বলা

যায় যখন চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন যদি মনে করে যে আমিই দেখি- তাকেই বলে সৎকায় দৃষ্টি। অনুরূপ ভাবে শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান ও কায় বিজ্ঞান প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি নিজকে শ্রবণ, আঘ্রাণ, আত্মাধন ও স্পর্শ ব্যাপার নিজকে মনে মনে ধারণ করে তবে তাকে সৎকায় দৃষ্টি বলে। যখন মনো বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ধারণা করে যে আমিই চিন্তা করছি তাকেও সৎকায় দৃষ্টি বলে। যখন ভুল চেতনার কারণে আমি, অহং ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব মনে করা হয় তাকেই সৎকায় দৃষ্টি বলে। যখন যোগী সচেতন জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে, অবলোকন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও আত্মাধন সবকিছুই কেবল স্ফঙ্কেরই উদয় মাত্র- ইহাতে অহং বোধ, আমি ও ব্যক্তি বলে কিছুই নেই, তখন বলা যাবে সৎকায় দৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে।

সাধারণ ব্যক্তি বর্গ ভুল প্রবণতা বশতঃ সৎকায় ও দৃষ্টিকে একত্রিত করে ফেলে। যোগীদের যা করা উচিত তা হল সৎকায় এবং তা হল সৎকায় এবং সম্যক দৃষ্টিকে একত্রিত করা। যা সৎকায় ও দৃষ্টির সংমিশ্রণ যা সৎকায় দৃষ্টিকে সংগঠিত করে।

সমস্ত সংসার জুড়ে আমরা সৎকায় ও দৃষ্টিকে সংযুক্ত ও মিশ্রিত করে রেখেছি। আমরা কি আহার করি?

সবসময় পৃথ্বীভূত পঞ্চস্ফঙ্কের যে কোন একটি পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। স্ফঙ্ক উৎপত্তিতে অন্য কিছু ধারণা না করে এবং আমি, অহং, আমার সহিত মিশ্রিত না করে কেবল স্ফঙ্ক উৎপন্ন হয়েছে বলে যথার্থ জ্ঞানে জানতে হবে।

এখন যোগী সৎকায় সম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। সুতরাং তিনি সৎকায় ও সম্যক দৃষ্টি জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন।<sup>১</sup>

মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ এর নিয়ম হল এ সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলি যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন যোগীকে বিদর্শন ধ্যান দেওয়া উচিত নয়। কারণ জ্ঞাত পরিজ্ঞান দ্বারা দৃষ্টিকে দূর করা হয়েছে। জ্ঞাত পরিজ্ঞানের পর তীরণ পরিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

অতএব যোগীদের উচিত অনাকাঙ্ক্ষিত ধর্ম পরিত্যাগ করে ঈম্পিত ধর্ম যথা সম্যক দৃষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত।

যখন একজন যোগী সৎকায়কে কেবল সৎকায় হিসাবে দেখেন এবং ইহার যথার্থ স্বরূপ যদি দৃষ্টির সহিত সন্দেহমুক্ত হয় তবে তিনি মিথ্যাদৃষ্টি শৃঙ্খল চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন এবং পরবর্তী জন্মে অপায় গতির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

-----○-----

## উনবিংশ অধ্যায়

### চিহ্নানুপস্‌সনা

#### তেরটি চিহ্নকে স্মৃতি অনুশীলন করার পদ্ধতি

যারা নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই স্রোতাপত্তি মার্গ, সকৃদাগামী মার্গ ও অনাগামী মার্গ অতিক্রম করতে হবে। পরিস্কার ভাবে জানার বিষয় যে প্রথম স্তর স্রোতাপত্তি মার্গ অর্জন

---

<sup>১</sup>। আগ্রহী যোগীদের উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে ফলপ্রসূ ভাবে বিদর্শন অনুশীলন করতে হলে সর্ব প্রথম মৌলিক বিষয় গুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যথা- প্রথমে নাম-রূপ, দ্বিতীয়ত প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব।



করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা দূরীভূত করতে হবে।

দিট্ঠি চরিতংসাপি মন্ধস্ স নাতিশ্ল ভেদগতং চিত্তানুপস্ সনা-  
(স্মৃতিপ্রস্থান বিশুদ্ধিমার্গ)

ইহার অর্থ এই যে যোগী যাদের দৃষ্টির দুর্বলতা রয়েছে এবং যারা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ক্ষীণ তাদের জন্য সরল এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অভিব্যক্ত চিত্তানুপস্ সনা মার্গ লাভের জন্য খুবই উপযোগী।

প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত এবং গভীর ভাবে চিত্তানুপস্ সনা স্মৃতি ভাবনার পদ্ধতি উপস্থান আবিষ্কার করেছেন যা বর্তমান যুগের মানুষ যাদের প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতার ঝোক আছে তাদের জন্য সহজেই প্রযোজ্য। নিম্নে তের প্রকার চিত্তকে গভীর ভাবে অনুশীলন করতে হবে স্মরণ রাখতে হবে একই সময়ে তের প্রকার চিত্ত এক সাথে স্মৃতি করতে হবে না। এক ক্ষণে এক চিত্তই উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে সময়ে যে চিত্ত যখনই উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণে তাকে স্মৃতি সহকারে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। ইহাদের কে ঞ্জ্ঞানং উল্লঙ্ঘতি চিত্ত, ঞ্জ্ঞানং নিরুজ্জতি চিত্ত, একটি চেতনা নিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আর একটি উৎপন্ন হয়।

প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ এর স্মৃতি অনুশীলন পদ্ধতিতে তের প্রকার চিত্ত রয়েছে- যথা-

১। চক্ষু চিত্ত

২। শ্রবণ চিত্ত

৩। স্পর্শ চিত্ত

বহিরাগত অতিথি চিত্ত

৪। জিহ্বা চিত্ত

৫। কায় চিত্ত

৬। লোভ চিত্ত

৭। দ্বেষ চিত্ত

৮। মোহ চিত্ত

আভ্যন্তরিন অতিথি চিত্ত

৯। অলোভ চিত্ত

১০। অদ্বেষ চিত্ত

১১। ভাব চিত্ত

১২। আশ্বাস চিত্ত

মূল চিত্ত বা অতিথি সেবক চিত্ত

১৩। প্রশ্বাস চিত্ত

এ সমস্ত তের প্রকার চিত্ত সবাই জড়াজড়ি করে সব চিত্তকে আড়াল করে রাখে এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে চিত্তই উৎপন্ন হউক না কেন তা দৃঢ় আলম্বন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারে দৃঢ়ভাবে প্রতিভাত হয় বলে ষড়্‌ন্দ্রিয়ের ষষ্ঠ দ্বারে বা চিত্ত উৎপন্ন হয়। ষড়্‌ন্দ্রিয় দ্বারের বাহিরে কোন দিন কোন চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না।

মনে রাখা প্রয়োজন চিত্ত এবং বেদনা সহজাত ধম্ম (সহ-অবস্থানকারী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়)। আরো বলা যায় বেদনা এবং সংজ্ঞা বা সঞ্ঞা চিত্তসংস্কার হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। ইহা কোন ভাবেই বলা যাবে না যে যখন নামস্কন্ধ ভাবনা করা হয় তখন রূপ স্কন্ধকে বর্জন করা হয়। যেহেতু স্কন্ধসমূহ সহ অবস্থায় উৎপন্ন হয়, সহ-অবস্থান করে এবং এক সঙ্গে নিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এরূপ বিষয়ভূত বস্তু (সংযুক্ত ধম্ম) সে জন্য বলা যেতে পারে এক স্কন্ধের প্রতি গভীর ভাবে স্মৃতি করলে অবশিষ্ট স্কন্ধসমূহও অনুশীলন হয়। কিন্তু এখানে চিত্তই হল একমাত্র প্রধান ও প্রকৃষ্ট ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়- ইহাকে চিত্তানুপস্সনা হিসাবে গন্য করা

হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রাণীদের পঞ্চ স্কন্ধসমূহ এক অন্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত- যাহা কাগজী লেবুর শরবতের মত যাতে সমস্ত উপাদান যেমন- লেবুর রস, চিনি, লবন, পানি পরিমাণ মত সংমিশ্রিত রয়েছে। সুতরাং চিত্তানুপস্সনা ভাবনা অনুশীলন করা হয় কায়ানুপস্সনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কারণ আশ্বাস চিত্ত এবং প্রশ্বাস চিত্ত এই চিত্তানুপস্সনা একীভূত হয়েছে। এই কারণে কায়ানুপস্সনা অথবা বেদনানুপস্সনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিণামে অন্য সমস্ত অনুপস্সনাও সম্মিলিত ভাবে প্রবাহমান এবং ধম্মানুপস্সনার ইতি টানতে হবে কারণ সেখানে সচ্চ বা সত্য হল চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট বিষয়।

তের প্রকার চিত্ত উল্লেখ পূর্বক বলা যায় খাওয়া বা দ্রাণ নেওয়ার জন্য লোভ চিত্ত ইত্যাদি। ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য দ্বেষের থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। দান দেওয়ার চিন্তা বা চেতনা অলোভ বা বীতরাগ থেকে আসে। মোহ থেকে ঔদ্ধত্য চিত্ত উৎপন্ন হয়। অমোহ চিত্ত, প্রজ্ঞা তের প্রকার চিত্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রশ্ন হতে পারে কেন অমোহ চিত্তকে তেরটি চিত্তের সহিত সংযুক্ত করা হয়নি? উত্তর হল, অমোহ হল সম্যক দৃষ্টির মার্গাঙ্গ বা প্রজ্ঞা-তিনিই ভাবনাকারী। তাকেই তেরটি চিত্তের উপর ভাবনা করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে এক সময়ে একটি মাত্র চিত্তই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

অনেক গুলি চিত্তের মধ্যে থেকে একটি চিত্তকে বেঁচে নিয়ে ভাবনা করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। যোগীদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে এক সময়ে একটি চিত্তই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তদুপরি আমাদের মনকে পাহাড়া দিয়ে বা নিরক্ষণ করে তা বলা কঠিন নয়। কারণ যে কোন লোক ব্যক্ত করতে পারে এই মুহূর্তে তার মনে কি চিন্তা বা চেতনা প্রবাহিত হচ্ছে। যদি লোভ চিত্ত উৎপন্ন হয় তবে ঠিক ঠিক ভাবে বলতে পারবে লোভ চিত্তই উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং মনে রাখতে হবে আমাদের

নিজেদের চিত্ত উদয়-বিলয় প্রকৃতিকে নিরক্ষণ করে বা স্মৃতি করে যে কোন কেউ স্মৃতি অনুশীলনে মনোযোগী হওয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে যোগী চিত্তের উৎপত্তি বিনাশকে সঠিক ভাবে সচেতন জ্ঞানে অনুধাবন করতে পারেন তাহলে বলা যাবে তিনি নির্বাণ প্রবেশের সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

আমরা যখন চোখ খুলি তখন চোখের সম্মুখে সব কিছু দেখি। আমরা যাকে চক্ষু বিজ্ঞানের উৎপত্তি বলে থাকি তাকে সচেতন জ্ঞানে অনুধাবন করতে হবে। আবার যখন জিহ্বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হবে তাকেও ভাবনাময় জ্ঞানে অনুধাবন করতে হবে। আবার যখন বিরক্তি বা চুলকানি, সুখ বা দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হবে তাতে কায় বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে চিত্ত বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হউক না কেন যোগীকে ভাবনাময় জ্ঞানের সহিত অনুভূত উদয়-বিলয়কে দর্শন করতে হবে। যে বিজ্ঞানই চিত্তে উৎপন্ন হউক না কেন তা কিন্তু এক সময়ে একটি বিজ্ঞানই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এক সঙ্গে দুই বা ততোধিক চিত্ত উৎপত্তি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। স্মৃতি অনুশীলন চলাকালে বা প্রক্রিয়ায় নতুন যোগীদের বোধগম্যতা বা সম্যক দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে বিদর্শন বিষয়ের উদয়-বিলয়ের প্রতি মন কেন্দ্রিভূত হবে। উদয়-বিলয়ের প্রতি স্মৃতিমান না হলে তাকে বহুদূরে নিয়ে যাবে। সাধারণত এই ক্ষেত্রে যোগী স্পষ্ট ভাবে সম্যকদৃষ্টি দিয়ে দর্শন করা, যে চিত্তই উৎপন্ন হউক না কেন- লোভ, দ্বেষ, মোহ, অথবা অলোভ-অদ্বেষ তা বিনাশ বা বিলুপ্তি হয়ে নিজকে নিজে বর্জন করে থাকে। তিনি পরিষ্কার ভাবে দেখেন যে কোন চিত্তই পরপর দুই মুহূর্তের জন্য একই ভাবে বিদ্যমান থাকে না। চিত্ত বা চেতনার আয়ু ক্ষণ মুহূর্ত পর্যন্ত (এক দুই বলতে যতক্ষণ সময় প্রয়োজন) যাকে বলা হয়- ঞ্জ্ঞানং উপলব্ধি চিত্তং, ঞ্জ্ঞানং চিত্ত নিরুজ্জন্তি, ইহার অর্থ

এই একটি চিত্ত নিরুদ্ধ বা বিনাশ হওয়া পর আর একটি চিত্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং যোগী যখন প্রচেষ্টা করবেন যে চিত্তের উপর গভীর ভাবে স্মৃতি করার তখন যোগী কেবল মাত্র দেখবেন যে চিত্তকে নিবিষ্ট ভাবে অবলোকন করছেন তা কিন্তু আগেই বিলয় হয়ে গেছে। ইহাকে বলা হয় হতা অভাবেটন অনিচ্ছা অর্থাৎ অস্তিত্বের অভাবই অনিত্য। ইহার অর্থ ক্ষণস্থায়ী- কারণ উৎপন্ন হওয়ার ক্ষণ মুহূর্তেই অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়েছে। এজন্য যোগী যে কোন চিত্তকে স্মৃতি করুক না কেন তিনি কেবল দেখবেন চিত্ত বিলয় হচ্ছে। সবই অনিত্য। যদি যোগী চিত্ত বিনাশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এরূপ মনোবৃত্তির প্রতি অটল থাকে তবে তাকে “অনিচ্ছানুপস্সনা” অনিত্যানুপস্সনা বলা যাবে না কারণ যোগী “নিচ্ছ সঞ্ঞা” নিত্য সংজ্ঞা মুক্ত হয়নি। তাকে অবশ্যই স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয়ের প্রকৃত স্বভাব অনুদর্শন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সত্য কথা বলতে কি- অনিত্য- অনিত্য বা আনিচ্ছা-আনিচ্ছা আবৃত্তি করে বা মুখস্ত বলে অনিত্যকে অনুদর্শন করা যাবে না। যোগীকে সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ীত্বকে গুরুত্ব সহকারে নিরক্ষণ করে দর্শন করতে হবে যে সংস্কার যা প্রকাশ করে এবং জানিয়ে দেয় তা অনিত্যের নিজস্ব নির্মাণ পদ্ধতি নয়। তাকে মুখস্ত আবৃত্তি করে জপমালা গণে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় গোচর বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি। বিলয় এবং বিনাশ আমাদের জীব জগতে অহরহ সংগঠিত হচ্ছে। যাকে অনিত্য ধর্ম বলে এবং প্রতিনিয়ত জ্ঞাত করে যে স্কন্ধ সমূহ উৎপন্ন হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। বিষয়টি কেবল মাত্র বিদর্শনের সম্যক দৃষ্টি দিয়ে যোগী দর্শন করতে পারবেন। এখানে আবার পুনঃরাবৃত্তি করা যাচ্ছে যে চিত্ত উৎপত্তি- বিলয় বা চুক্তিভঙ্গ প্রাকৃতিক নিয়মে অনাদিপরম্পরায় প্রচলিত আছে তা “চিত্ত ধর্ম” স্কন্ধ সমূহের

উদয় প্রকৃত জ্ঞানই গোত্রভূজ্ঞান। ইহার অর্থ এই আমাদের জীব জগতে স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি-বিলয় ছাড়া আর কোন সত্য নেই।

অন্য ভাবে বলা যায় ইহাই স্কন্ধসমূহ সম্পর্কে প্রকৃত সত্যজ্ঞান।

উদয়-বিলয় অনুভূতির পর্যায়গুলি এতই দ্রুত সংগঠিত হয় যে তা বোধগম্য ও ধারণার অতীত। যোগীদের সঠিক ভাবে জানার প্রয়োজন নাই যে ভিত্তি মোতাবেক কত দ্রুত ঘটছে। এখন প্রয়োজন শুধু স্কন্ধসমূহের উত্তান ও বিনাশকে অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে। এখন আবার মূল চিত্ত প্রসঙ্গে বলা যায় যোগীকে গভীর অনুদর্শনের সহিত আশ্বাস চিত্ত ও প্রশ্বাস চিত্ত (শ্বাস নেওয়া ও শ্বাস ফেলা) কে গভীর স্মৃতি সহকারে নিরক্ষণ করতে হবে যে এ দুধরণের চিত্ত কি ভাবে উৎপন্ন ও বিনাশ ও কিভাবে চলে যাচ্ছে।

যখন আশ্বাস চিত্তকে গভীর স্মৃতি দিয়ে নিরক্ষণ করা হয় তখন দেখা যায় যে ইহা এই সময়ের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনুরূপ করে প্রশ্বাস চিত্তকে স্মৃতি দিয়ে নিরক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রশ্বাস চিত্ত এই সময়ের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে বিলয় হয়ে গেছে। এজন্য যে চিত্ত সমূহ এই সময়ের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিলয় হয়ে গেছে তাদেরকে অনিত্য বলে এবং পরবর্তী চিত্তসমূহ যা পূর্ব গুলির মত এই সময়ের মধ্য ক্ষয় ও বিলয় প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে বিপস্সনা মার্গ বলে।

স্মৃতি অনুশীলন করার সময় যোগীদের অবশ্যই স্মৃতিমান হয়ে আশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে এবং চিত্তদ্বয় যে প্রকৃতগত ভাবে ক্ষণস্থায়ী তাও দর্শন করতে হবে। এভাবে যোগী দুটি জিনিস অনিত্য ও মার্গ কে লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক অতিথি চিত্তের নামা-করণের কারন হল, ত্রিপিটক গ্রন্থে- “ভিক্খু আগন্তেহি উপকিঞ্চেহি” আভ্যন্ত

রিন ও বাহ্যিক এগারটি অস্থায়ী চিত্ত স্থায়ী ভাবে উৎপন্ন হয় না- কেবল মাঝে মাঝে উৎপন্ন হয়। এজন্য অতিথি চিত্ত বলে।

প্রশ্ন করা হতে পারে এই চিত্তানুপস্ফুটনা অনুশীলন কখন কোথায় হতে পারে? বিদর্শন কেন্দ্রে না বিহারে? উত্তর হল এই যেখানেই চিত্ত উৎপন্ন হয় সেখানেই অনুশীলন করতে পারেন। চক্রমণ করার সময় যদি চিত্ত উৎপন্ন হয় তবে কি চক্রমণ স্মৃতি অনুশীলন করতে হবে? ইহা অবশ্যই পর্যবেক্ষিত বা জ্ঞাত যে প্রত্যেকটি চিত্ত প্রতিটি পদক্ষেপে কেবল উৎপন্ন হয় না ক্ষয়ও প্রাপ্ত হয়। খাওয়ার সময় পান করার সময় যখনই চিত্ত উৎপন্ন হবে সাথে সাথেই পদ্ধতিগত ভাবে স্মৃতি করতে হবে। আপনার অফিসে বসা অবস্থায় যদি উৎপন্ন হয় সাথে সাথেই স্মৃতি করতে হবে। স্মৃতি অনুশীলনের মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয় একাত্মভাবে- স্মৃতিময় প্রচেষ্টার সাথে পাহাড়া দিয়ে চিত্তকে অনুধাবন করা। উৎপত্তি বিনাশকে যতই কাছাকাছি থেকে সম্যক ভাবে দর্শন করতে সক্ষম হবে তত বেশি যোগী উপকৃত হবে। আর কোন স্মৃতি বিঘ্নকারী, সন্দেহ, (লোভ, দ্বেষ, মোহ) দেখা যাবে কি? প্রত্যেকটি ব্যাপারে যাই উৎপন্ন হোক না কেন উৎপত্তি বিনাশকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগীদের আরো উপকারের জন্য আবারও ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী চিত্ত যা এ সময়ের মধ্যে নিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তা অনিত্য এবং পরবর্তী আসন্ন উৎপন্ন চিত্ত (যাকে ভাবনা করা হচ্ছে) যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রচেষ্টার সাথে পাহাড়া দেওয়া বা নিরক্ষণ করা হচ্ছে তাকে মার্গ বলে। এজন্য অনিত্য মার্গের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় লোপ পাওয়া চিত্ত বা চেতনাকে অনিত্য বলা হয়। কারণ ক্ষণস্থায়ী ও পরবর্তী মুহূর্তে আবার একইভাবে অবতীর্ণ হবে এবং এই বিলুপ্ত চিত্তকে যদি অতি নিকট থেকে স্মৃতি সহকারে চিত্ত দ্বারা দর্শন করা হয় তাই মার্গ, কারণ অব্যবহিত (পরবর্তী চিত্ত) চিত্ত হল বিপস্ফুটনা সম্মা দিট্ঠি অথবা

বিপস্সনা মার্গ। এজন্য ইহাতে পরস্পর বিষয় সমূহের যথা-অনিত্য মার্গ, অনিত্য মার্গ, এরূপ ধারাবাহিকতা থাকবে।

অনুশীলনকারী যোগীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে বিদর্শন ভাবনায় তাঁদের দেখতে হবে যে পূর্ববর্তী অনিত্য পরবর্তী মার্গ একের পর এক সহগামী অনিত্য ও মার্গের ধারে ধারে অগ্রসর হতে বাঁধা দান করে। অন্যভাবে বলা যায় যে চিন্তা বিনাশ- হয়েছে তা হারানো যাবে না। কিন্তু তাকে সাথে সাথেই চিহ্নিত ও নিরক্ষণ করে বুঝতে হবে যে পূর্ববর্তী চিন্তা অনিত্য কারণ ইহা বিনাশ হয়ে গেছে। পরবর্তী অনুসরণকৃত চিন্তাকে বলা হয় মার্গ কারণ ধারণা করা হয় যে পূর্ববর্তী চিন্তা একই সময়ে বিনাশ ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অনুশীলন কালীন সময়ে যোগী সমস্ত রকম চিন্তা যা প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক, আকাজ্জিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত, সব কিছু অতিক্রম করবে। তাদেরকে অবশ্যই বিষয়ের উপর স্মৃতি নিবদ্ধ করতে হবে। বিক্ষিপ্ততা বা ভিন্নমুখী হওয়া কারণে যোগীদের হতাশা হওয়া উচিত নয়। ইহা কিন্তু অনুশীলনে বিশেষ ভাবে দেখার বিষয় মাত্র।

ধর্মের ছয় গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে “এহিপসিসকো” ইহার অর্থ আস এবং দেখ। এজন্য বলা যায় ধর্ম (চিন্তা) স্মৃতিকে আহ্বান করছে আস এবং স্মৃতিমান হয়ে উদয়-বিলয় দর্শন করে। যা প্রতিনিয়ত উৎপত্তি বিনাশ প্রক্রিয়ায় অনিত্য ধর্মের অধীনস্থ হচ্ছে।

যোগীগণ যদি বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করা কালীন উদয়-বিলয় কে স্মৃতি সহকারে পর্যবেক্ষণ করার সময় যদি খুব সামান্য বাঁধার সম্মুখীন বা ভুল করে থাকে তবে বলা যাবে তাদের কিছু দূর উন্নতি হয়েছে। উদয়-বিলয়কে দর্শন করার সময় মধ্যখানে ক্লেশ অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। ইহাতে বলা যাবে যে স্মৃতি



শক্তিমান যোগী এমন এক স্তরে অবতীর্ণ হয়েছেন যেখান থেকে ক্রেশের শৃঙ্খল খণ্ড খণ্ড করে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সক্ষম হবেন এবং স্রোতাপত্তি মার্গ তাদের জন্য আর বেশি দূরে নয়।

ইধ ভিক্ষবে একচো পুগ্নলো সব্ব সজ্জারেসু অনিচ্চানুপস্সী বিহরতি অনিচ্চ সঞ্ণী অনিচ্চং পটিসংবেদী সততং সমিতং অবেকিনিং চেতসা অধিমুত্ত মানো পঞ্ণাণ পরিযোগালামানো। যো আসাবনং যো অনাসবং চেতো বিমুত্ত পঞ্ণা বিমুত্তং দিট্ঠেব ধম্মে মযং অভিঞ্ণা সচ্চিকত্তা উপসম্পজ্জ বিহরতি।

অর্থ এই, যে আর্য্য যোগীগণ সম্প্রজ্ঞান নির্ভুল ভাবে চিত্তানুপস্সনা নিয়ে জীবন যাপন করেন এবং সম্যকদৃষ্টি দিয়ে ধারণ করেন যে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, ক্ষয়ধর্মী, ও ব্যয় ধর্মী, বিরাগধর্মী, কোন কিছুই পর পর দুই মুহূর্তের জন্য একই রকম অবস্থায় থাকে না। এই ভাবে অনুশীলনকারী যোগীগণ কেবল মাত্র অনিত্য জ্ঞান দ্বারা কোন ক্রেশ ছাড়া সমস্ত আসব হতে মুক্ত হয়ে এই জন্মেই নির্বাণ সাক্ষাতে সক্ষম হবেন।

সাধু! সাধু! সাধু!

বিদর্শন অনুশীলনকালীন যোগীদের উচিত কোন রকম ক্রেশকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য চিত্তকে একাগ্র করা বা কেন্দ্রীভূত করার জন্য বার বার প্রচেষ্টা চালানো এবং উদয়-বিলয় জনিত যে কোন চিত্ত যে কোন ধর্ম যাই প্রদর্শিত ও প্রকাশিত হচ্ছে তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

মজ্জিম নিকায়ে বলেছেন যখন পূর্ববর্তী অনিত্য এবং পরবর্তী মার্গের মধ্যখানে কোন ক্রেশ উৎপন্ন হবে না তাতে সাতদিনের মধ্যে প্রজ্ঞা বিমুক্ত, সংস্কার বিমুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

সাধু! সাধু! সাধু!

উদয় বিলয় সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টি লাভ করার ফলে উদয়-ব্যয় জ্ঞান বা যথাভূত জ্ঞান অর্জিত হয়। যার দ্বারা স্কন্ধসমূহের আসল কার্যক্রম দর্শন করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে স্কন্ধসমূহ আর কিছুই নয় কেবল উৎপত্তি বিনাশ মাত্র বা দুঃখ সত্য।

প্রশ্ন করা যেতে পারে স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি বিনাশ সম্পর্কে যোগী সম্যকদৃষ্টি অর্জন করে কি উপকার পেতে পারেন? উপমা স্বরূপ উত্তর দেওয়া যায়- যখন লোভ চিন্তা উৎপন্ন হয় তখন যদি যোগী বিদর্শন ধ্যানের মাধ্যমে নিরক্ষণ করেন তখন যোগী কেবলমাত্র উৎপত্তি বিনাশ ছাড়া তার ধারণা কৃত লোভ চিন্তাকে কোথাও খুঁজে পাবেন না। ইহার অর্থ লোভ চিন্তা বলে কিছুই নেই। এজন্য প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রক্রিয়ার মধ্যখানে খণ্ড বিখণ্ড করা। ইহার অন্য অর্থ হল লোভ চিন্তাকে ক্ষয় করা হয়েছে। যদি লোভ চিন্তাকে গভীর ভাবে স্মৃতির মাধ্যমে ভাবনা করা না হয় তবে নির্গাত উপাদান লোভ বা তৃষ্ণার পশ্চাৎ অনুসরণ করবে, যা আবার নিয়ম অনুসারে কর্মভাবে মোড় নেবে। যখন কর্মভব উৎপন্ন হবে তখন অবশ্যই জাতি বা জন্ম পশ্চাৎ ধাবিত হবেই। যখন জাতি উৎপন্ন হবে পরিনামে দুঃখেরই করালগ্রস্ত হয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রের আওতাবদ্ধ হতে বাধ্য হবে। এভাবেই অনাদি পরম্পরায় সংসার চক্রে পুনঃ জন্ম ঘূর্ণিয়মান অবস্থায় প্রবর্তীত থাকবে।

মনে রাখতে হবে যে উৎপত্তি-বিনাশকে গভীর ভাবে স্মৃতিপটে নিরক্ষণ করা অর্থ অনিত্য দর্শন করে সংসার চক্রের পুনঃজন্ম রোধ করা। এভাবেই সংসার চক্রের চাকা বা স্পোক ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ শৃঙ্খল কেটে টুকরা টুকরা করার কাজ। অন্যভাবে বলা যায় ইহার দ্বারা অবিদ্যা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বিদ্যা আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার প্রচেষ্টা, একাগ্রতার সহিত উদয় এবং ব্যয়কে গভীর ভাবে নিরক্ষণ করে অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি বিনাশ এর অন্তর্নিহিত

সত্য হল দুঃখ সত্য যা কেবল মাত্র বিদর্শনের জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যখন সম্যকদৃষ্টি দিয়ে দেখে উৎপন্ন লোকোত্তর জ্ঞান যখন ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সম্যকদৃষ্টি অর্জিত হয় তখন বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তাতে অবিদ্যা দূরীভূত হয়। ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে বলেছেন- “চক্ষুঃ উদাপাদি, ঞ্জ্ঞানং উদাপাদি, বিজ্ঞা উদাপাদি, আলোকো উদাপাদি,” ইহার অর্থ এই যখন দুঃখ সত্য সম্পর্কে সম্যকদৃষ্টি দিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হলে অবিদ্যা বিদ্যাতে পরিণত হয়। এজন্য বলা হয়েছে অবিদ্যা বিলুপ্ত হয়ে সেই স্থানে বিদ্যা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

চক্র মোতাবেক পরিলক্ষিত হয় যখন অবিদ্যা বিদ্যায় রূপান্তর হয় তখন সংস্কার আর বিজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ এক নং অংশ দুই নং অংশের সহিত সংযুক্ত হতে পারে না। যখন সংযোজন ঘটে না তখন সংস্কার কোন ফলপ্রসূ কাজের মাধ্যমে নতুন ভাবে জন্ম বা জাতি সংস্করণে সক্ষম হয় না। (সাধারণত অপায় গতি)। মহান বুদ্ধ বলেছেন- একশত হাজার বা এক লক্ষ মৃতের মধ্যে কদাচিৎ একটি প্রাণী পরবর্তী লোকে উচ্চতর স্তরে জন্ম ধারণ করে থাকেন। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র শুরুতেই ভঙ্গ হয়ে গেছে। সংযুক্তি অর্থ পরবর্তী জন্মের জন্য নতুন স্কন্ধ সমূহ সংগঠিত করা।

ধ্যান অনুশীলনের কারণে নুতন ভাবে জন্ম বা জাতি প্রক্রিয়াজাত করার জন্য পঞ্চুপাদান স্কন্ধ সামগ্রী সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। জন্ম আর রূপ নিতে পারে না। অবিদ্যা বিদ্যায় রূপান্তর হওয়ার ক্ষণ মূহুর্তেই জন্ম রোধ হবেই। এজন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় প্রতীত্যসমুৎপাদের সংযোজন শুরুতেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। সুতরাং আর কোনদিন অপায় গতি সংগঠিত হবে না।

যখন দৃষ্টি উচ্ছেদ হয় তখন স্কন্ধসমূহের গুরুত্ব বা ফলাফল স্তব্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে বিচিকিৎসা যদি ধ্বংস করা যায় তখন বিচিকিৎসা কারণে উৎপন্ন স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ও বন্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ ধারাবাহিক ভাবে ধাপে ধাপে অন্যান্য অনুশয় ক্লেশ কারণে স্কন্ধসমূহের স্বাভাবিক পরিণতির অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। সেই কারণেই প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ গভীর করুণা পরবশ হয়ে বার বার যোগীদেরকে স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয় প্রক্রিয়ার উপর স্মৃতি অনুশীলন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যখন যোগীগণের স্কন্ধসমূহের উদয়-বিলয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয় তখন তাকে যথাভূত ঞ্জ্ঞানং বলে। যখন যোগী স্কন্ধসমূহের বিরামহীন উদয়-বিলয় প্রতিক্রিয়ার প্রতি বিরক্ত হয় তখন তাকে নির্বেধজ্ঞান বলে। জ্ঞান অর্জন করার পর যোগী যখন স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি বিনাশের উপর ধ্যান নিবিষ্ট হয়ে থাকেন তাকে মার্গ জ্ঞান বলে। যারা এই তিনটি জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে মহাস্রোতাপন্ন বলা হয়।

মহাস্রোতাপন্ন আর্য্যাগণ এর অবস্থান ও সম্মান জগৎ এর সম্রাট, চক্রবর্তী রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের বহু উর্দ্বে। কারণ বুদ্ধের বর্ণনা মতে “চতুহপায়েহি চ বিশ্বমুত্তো” অর্থাৎ মহাস্রোতাপন্ন গণ চারি অপায়ে পতন হতে রক্ষা প্রাপ্ত, আবার একই সূত্রে বলেছেন “হু চা ভিট্ঠানানি অভবো কাতুং” স্রোতাপন্নরা কুষ্ঠ, বোবা, কানে খাট, অন্ধ, খোড়া, খঞ্জ হয় না। উচ্চতর জ্ঞান অরহত মার্গ ফল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য পরিনির্বাণ লাভ করার আগে সাত বারের বেশি জন্ম নেবেন না। অর্থাৎ সাত জন্মের মধ্যে যে কোন একটিতে নির্বাণ সুখ প্রাপ্ত হবেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে স্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি এবং বিনাশকে কেবল যোগী জানবেন। যে হেতু উৎপত্তি বিনাশ দুঃখ

জনক এজন্য উদয়-ব্যয় জ্ঞান হল মার্গ জ্ঞান যাহা প্রজ্ঞা মার্গ। যার পরিণাম ফল হল প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র শুরুতেই ভঙ্গ হয়ে গেছে। ফলে তৃষ্ণা, মান, দৃষ্টি ও পরিত্যক্ত হয়েছে বিধায় প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র মধ্যখানে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেছে। তদুপরি তাদের দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপত্তিরও কোন সম্ভাবনা নেই, কাজেই প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্র সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পরিসমাণ্ড হয়েছে। আর্য্যসত্য অনুসারে দুঃখের উৎপত্তি বিনাশ হল দুঃখ সত্য, এ সম্পর্কে জ্ঞান হল মার্গসত্য। তৃষ্ণা, মান ও দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করা সমুদয় সত্যের ক্ষান্তি, জাতি, জরা, মরণের অনুপোস্থিতি হল নিরোধ সত্য।

সুতরাং উৎপত্তি বিনাশের উপর একান্ত মনোযোগ বা ধ্যান চতুরার্য্য সত্যকে পূর্ণতা দান করে। এজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চতুরার্য্য সত্য বিদর্শন ধ্যানে অনুশীলন একান্তই কর্তব্য। যোগীরা যদি একদিন বিলম্ব করেন তবে একদিনের সুযোগ হতে চ্যুত হবেন কারণ যেকোন দিন যে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা সংগঠিত হতে পারে, তদুপরি বার্ষক্য জনিত কারণে ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয়ও রয়েছে।

বিদর্শন ধ্যানই একমাত্র পথ যা অদৃশ্য বিপদ অপায় ভূমিতে পতনের হাত থেকে আগাম প্রতিহত করতে সক্ষম।

-----○-----

## বিংশতি অধ্যায়

চারজন অরহত ও কিছু পৃথকজন ভিক্ষু প্রসঙ্গে

বুদ্ধ যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন একজন ভিক্ষু একজন অরহতের নিকট প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিভাবে নির্বাণকে অনুভব ও সাক্ষাত করা যায়।

কিন্তাবতা মুখো আবুসো যথাভূতং

ঞাণদস্সনং সুবিসুদ্ধং হোতি ।

যতো খো আবুসো ছন্নং আযতনামং

সমুদযং অন্তঃসমঞ্চং যথাভূতং এঞাণদস্সনং সুবিসুদ্ধং হোতি ।

আবুসো যদি নির্বাণের স্বরূপ যথাযথ সুবিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শন করতে চাও ষড়ায়তন- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন সমূহ সম্যক ভাবে জেনে ইহাদের উদয়-বিলয় সম্পর্কে বিশদ ভাবে অবহিত হয়ে তাদের প্রকৃত স্বভাবকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। নাম-রূপ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যে ইহারা উৎপত্তি ও বিনাশশীল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় বা বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। যিনি ষড়ইন্দ্রিয় সম্পর্কে জ্ঞাত তিনিই নির্বাণ দর্শন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম।

প্রশ্নকারী ভিক্ষু পৃথকজন হেতু উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, কারণ তিনি চিন্তা করেছিলেন যে তাঁর অন্তর্ভুক্ত বিষয় (ষড়ায়তন) যার উপর স্মৃতি করতে হবে তা সংখ্যায় অনেক বেশি। তিনি উদয়-বিলয় জ্ঞান আহরনকে গুরুত্ব না দিয়ে সংখ্যাকে বেশি আবশ্যিক মনে করেছেন। এত বেশি সংখ্যার উপর কাজ করা তার পক্ষে কঠিন তা মনে করে অন্য একজন অরহতকে একই প্রশ্ন করলেন।

দ্বিতীয় অরহত উত্তর দিয়েছিলেন যে যদি কোন ভিক্ষু নির্বাণ দর্শন ও অনুভব করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই পঞ্চস্কন্ধ সমূহের উৎপত্তি-বিনাশ সম্পর্কে অবহিত ও ধারণা অর্জনে চেষ্টার মাধ্যমে জানতে হবে প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত বিষয়গুলি কি? ভিক্ষু এই উত্তরেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি কারণ ইহাও তার পক্ষে অনেক বেশি বোঝা। ইহা স্পষ্ট যে পৃথক জন ভিক্ষু প্রয়োজনীয় বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে সংখ্যার উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অরহতের উত্তরে সম্ভ্রষ্ট হতে না পেরে তিনি তৃতীয় অরহতের নিকট গিয়ে একই প্রশ্ন করলেন। তৃতীয় অরহত উত্তরে বললেন তিনি নির্বাণ দর্শন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম যিনি চতুর্মহাভূত যথা- পৃথিবী ধাতু, অপধাতু, তেজধাতু ও বায়ু ধাতুকে সম্যকভাবে অবহিত হয়ে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম।

পৃথকজন ভিক্ষু যদিও বা মনে করলেন যে তৃতীয় অরহতের উত্তর প্রথম ও দ্বিতীয় অরহতদের উত্তর হতে কিছুটা ভাল তবুও তিনি সম্ভ্রষ্ট হতে পারেন নি। তিনি ধারণা করতে অক্ষম হয়ে উদয়-বিলয় এর উপর বিশেষত্ব আরোপ না করে সংখ্যার উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

পৃথকজন ভিক্ষু চতুর্থ অরহতের নিকট গিয়ে একই প্রশ্ন করেছিলেন “এবং কিঞ্চিৎ সমুদয় ধম্ম সৰ্ব্বতং নিরোধ ধম্মতি।” যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বস্তু উৎপন্ন হোক না তা বিনাশ প্রাপ্ত হতে বাধ্য। যিনি এই ধর্ম ধারণা বা অনুভব করতে পারেন তিনিই নির্বাণ দর্শন ও উপলব্ধি করতে পারেন।

ভিক্ষু শেষ অরহতের উত্তরেও সম্ভ্রষ্ট হতে পারেননি কারণ তিনি চিন্তা করলেন যে তাকে এখনো দুটি ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি কখনো ধারণা করতে পারেননি যে জ্ঞান অর্জন করতে কেবল মাত্র উদয়-বিলয়ের উপর। কিন্তু ষড়ায়তন, পঞ্চস্কন্ধ, চতুর্মহাভূত, ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর নয়। উৎপত্তি বিনাশ অথবা অনিত্যতাই বিদর্শন ভাবনার কেন্দ্রিয় মর্ম বস্তু। এভাবে তিনি বুদ্ধের নিকট গিয়ে চার অরহত হতে যা শুনেছেন তা ব্যক্ত করে অতৃপ্তি প্রকাশ করলেন।

মহান বুদ্ধ ভিক্ষুকে বললেন- একজন লোক সে কোনদিন কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখেনি। সে পথে বেড়় হয়ে প্রথম জন যে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কি কোন দিন কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখেছেন? তখন লোকটি উত্তর দিয়েছিল হাঁ

দেখেছি তা দেখতে কাল। কারণ গাছটি পোড়ানোর পরে আমি দেখেছি। সম্ভ্রষ্ট না হয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে একই প্রশ্ন করলেন। লোকটি উত্তর দিলেন কৃষ্ণচূড়া গাছ মাংস খণ্ডের মত দেখতে। কারণ আমি গাছটিকে পুষ্টিপিত অবস্থায় দেখেছিলাম।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তরে সম্ভ্রষ্ট হতে না পেয়ে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখতে কেমন? লোকটি উত্তর দিয়েছিলেন গাছটি অনেকটা খাপ বদ্ধ তরবাড়ির মত। কারণ কৃষ্ণচূড়া গাছটি আমি দেখেছিলাম তখন গাছটি ফলন্ত অবস্থায় ছিল। তাতেও সম্ভ্রষ্ট হতে না পেয়ে চতুর্থ ব্যক্তিকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন কৃষ্ণচূড়া গাছের পত্র সমূহ বট বৃক্ষ সদৃশ্য কারণ- আমি গাছটিকে বসন্ত কালে দেখেছিলাম তখন ইহা সুন্দর সবুজ ছায়া ঘন পত্র পল্লবে ভরপুর ছিল। মহান বুদ্ধ চারজন লোকের বিস্তৃত কৃষ্ণচূড়া গাছের বর্ণনা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিস্তৃত বর্ণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল। অনুরূপ ভাবে চারজন অরহত যার উচ্চস্তরে আলোক সম্প্রাপ্ত হয়েছে এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান অর্জন করেছেন। বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম দর্শন শক্তি অর্জন করেছেন তাদের বক্তব্য নিজস্ব ধারা মতে সম্পূর্ণ সঠিক। কারণ, তারা সকলেই উৎপত্তি-বিনাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। “সমুদয় সত্য এবং সমুদয়ঃ অট্টংগমঃ”।

মনে রাখতে হবে এই সমস্ত কিছু ষড়ায়তনও নয়, পঞ্চাঙ্কসমূহও নয়, চার মহাভূতও নয়, বা অন্যকোন মানদণ্ড বা আদর্শও নয়। কিন্তু এসব কিছু সমুদয় সত্য বা উৎপত্তি বিলয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। উদয়-বিলয় হল বিচারের মাপকাঠি কারণ প্রাণী জগতে উদয়-বিলয় ছাড়া আর কিছুই নেই। বিদর্শন ধ্যানে ইহাই গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড যা যোগীকে অনিত্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি অর্জনে সহায়ক। অনিত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখ সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। বলা যায় যে



অনিত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে সত্য অনুলোম জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। যোগীদের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয় হল দৃঢ়তার সাথে দ্রুতগতিতে সেই উদয় বিলয় মানদণ্ডকে আকড়িয়ে ধরতে হবে। এই স্তরে যোগী অন্তত উপসংহারে আসতে পারবেন যে উৎপত্তি-বিনাশ উপলব্ধির ক্ষমতা ছাড়া বিদর্শন নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে বিদর্শন ভাবনা অবশ্যই উদয়-ব্যয় দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। কাজেই উদয়-ব্যয় ব্যতীত তথাকথিত বিদর্শন কোন কারণেই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল বলা যাবে না। এজন্য তা নির্ভরযোগ্য নয়।

বুদ্ধ বলেছেন- “সর্বো সংখারা অনিচ্ছাতি এদা পঞ্ণায় পস্‌সতি। এতং নিবন্দতি দুক্‌থে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।” ইহার অর্থ হল- সর্ব সংস্কার অনিত্য ও দুঃখময়- এই অনিত্য ও দুঃখ ধর্মী অনাত্ম যথাযথ ভাবে দর্শন হলে নির্বেধ মার্গ জ্ঞানে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। ক্ষণস্থায়ীত্বকে যখনই বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় তখন যোগীদের মনে ক্ষণসমূহের প্রতি তীব্র বিরাগ এবং বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয় কারণ ক্ষান্তহীন ভাবে অবিরাম উৎপন্ন হচ্ছে এবং বিলুপ্ত হচ্ছে- যা দুঃখ সত্যরই নামান্তর। তিনি পরবর্তী জীবনের জন্য ক্ষণের প্রতি আসক্ত হবেন না। তৃষ্ণার প্রদীপ জ্বালাবেন। এতে বলা যায় তিনি নির্বাণের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহান বুদ্ধ বলেছেন- “অনিচ্ছ বত সংখারা উপ্পদা বয ধম্মিনো উপ্পজিত্বা নিরুজ্জন্তি তেসং বূপ সম সুখো” ইহার অর্থ এই রূপান্তরিত ও যৌগিক বিষয় বস্তু ক্ষণস্থায়ী, ইহারা নিয়ম অনুযায়ী উৎপন্ন ও বিনাশ শীল। উৎপন্ন হওয়ার পরে পরেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উৎপত্তি-বিলয়ের নিবৃত্তি এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসই পরম সুখ।

Suffering is the bliss- দুঃখের অস্তে পরমসুখই- নির্বাণ। উদয়ের পর বিলয় হয়- বিলয়ের পর আর কখনো সে চিত্ত ফিরে আসে না তাই নির্বাণ। এখন যোগীদের নিকট সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে উপরোক্ত গাথা কেবল মাত্র বুদ্ধ বন্দনার সময় আবৃত্তি করার জন্য নয়, ইহাই নিয়ম বা আদর্শ বিদর্শন অনুশীলনের সময় ভাবনা করা।

সতিপট্ঠান সূত্রে দেখা যায় চারটি অনুপস্সনার মধ্যে তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা- সমুদয় ধম্মানুপস্সী বিহরতি, বয় ধম্মানুপস্সী বিহরতি, সমুদয়বয় ধম্মানুপস্সী বিহরতি, ইহার অর্থ এই ভিক্ষুগণ বা যোগীগণ উদয়-ব্যয় ধ্যানুশীলন রত অবস্থায় জীবন যাপন করবেন।

এখন যোগীদের নিকট প্রমাণিত হল বিদর্শন ধ্যান অনুশীলনের সময় উদয়-ব্যয় আদর্শ কতই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য।

ধর্মপদে উল্লেখ আছে উদয়-ব্যয় জ্ঞান নিয়ে যিনি একদিন বাঁচে তিনি উদয়-ব্যয় জ্ঞানহীন শতায়ু ব্যক্তির চেয়ে বেশী উত্তম।

## বুদ্ধের দুই মহৎ শ্রাবকের প্রশ্নোত্তর

### রীতির মাধ্যমে উপদেশ

বুদ্ধের সময়ে একদিন কথিকা থের বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক মহান সারিপুত্রকে প্রশ্ন করেছিলেন। বন্ধু সারিপুত্র যদি কোন পৃথক জন যার বিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন এবং সঠিক যোনিসো মনসিকার (মার্গ অনুকূল) স্মৃতি আছে তিনি কি স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করতে পারেন? মহান সারিপুত্র উত্তরে বললেন- ভাই কথিকা যে পৃথক জন যারা শীলবান ও সঠিক মনসিকার আছে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করতে হলে অবশ্যই তাকে স্কন্ধসমূহের প্রকৃতি উদয়-ব্যয় এর প্রতি গভীর ভাবে স্মৃতিমান হতে হবে। কথিকা আবার প্রশ্ন

করলেন বন্ধু আমি কি জানতে পারি সকৃদাগামী মার্গ লাভ করতে হলে স্রোতাপন্থের করণীয় কি? মহান সারিপুত্র উত্তর দিয়েছিলেন স্রোতাপন্থকে সঠিক মনসিকার মাধ্যমে উদয়-ব্যয় স্বভাবকে সম্যক ভাবে স্মৃতি অনুশীলন করে সকৃদাগামী মার্গ লাভ করতে পারবেন।

কথিকা খের অনুরূপ ভাবে আবার মহান সারিপুত্রের প্রশ্ন করেছিলেন কোন পথ আলম্বন করলে কিভাবে সকৃদাগামী ও অনাগামী পরবর্তী উচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারেন। মহান সারিপুত্র একই ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন- উচ্চস্তর মার্গ পেতে হলে উদয়-ব্যয় প্রকৃতিকে অবশ্যই স্মৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে দর্শন করতে হবে। তিনি আরো যোগ করলেন- এমন কি অরহতগণও ধ্যানানুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সময় প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিষয় উদয়-ব্যয় স্মৃতি অনুশীলন এবং ধ্যান করতে হয় যাতে তাঁর সমাপত্তি ফল সুখ উপভোগ করতে পারেন। (ফল সমাপত্তি অর্থ বিশুদ্ধতা জ্ঞান প্রাপ্তি)

এখানে Yonisomanasikara বা যোনিস মনসিকার অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের সঠিক অনুকূল স্মৃতি অর্থাৎ রূপ রূপই (শারীরিক বা ভৌতিক জ্ঞান) তা আমি বা আমার নয়। বেদনা বেদনাই (অনুভূতি) তাও আমি নহি, আমার নয়। সংজ্ঞা সংস্কার, সংজ্ঞা সংস্কারই। তাও আমি নহি, আমার নহে। প্রকৃত পক্ষে যোনিস মনস্কার অর্থ প্রত্যেকটা বিষয় বস্তুকে পরমার্থ ধর্মের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে দেখা। (মূল সত্যকে নিরক্ষণ করা)

যোনিস মনস্কার ব্যতীত যোগীগণ বিষয় বস্তু সমূহের মূলসত্য দর্শন করা অসম্ভব।

নিখুঁত পঞ্চ বা অষ্টশীল যা খাঁটি ও আর্ঘ্যদের দ্বারা প্রশংসিত তা সমাধির সহায়ক।

শীল ও যোনিসমনস্কার আগ্রহী যোগীদের ধ্যানে প্রবেশের পূর্বভাগ। ইহার পরে কেবল বিদর্শন ধ্যান উদয়-ব্যয়, প্রাকৃতিক উৎপত্তি বিনাশ অনুধ্যান লওয়া উচিত।

যারা বেদনাকে নিয়ে ধ্যান করেন বেদনা তাদেরকে ডেকে বলবেন আস দেখ বেদনা কিভাবে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। অনুরূপ ভাবে চিন্তা ও যোগীকে ডেকে বলবে দেখ কিভাবে চিন্তা বিলয় হয়ে যাচ্ছে। ইহার দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে? “এহি পস্সিকো” এবং সন্দিট্ঠিকো, আস এবং দেখ। এই ডাক যোগীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ- জ্ঞান ও সম্যক উপলব্ধির মাধ্যমে এই ডাকে সারা দিতে হবে। যোগীরা তৃষ্ণা ও বিরক্তি বা দ্বেষ মনোভাব নিয়ে এই ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত নয়। ইহার অর্থ হল যখন যোগী সুখ বেদনার প্রতি তৃষ্ণা ও দুঃখ বেদনার প্রতি দ্বেষ বা দৌর্মনস্য নিয়ে সাড়া দেয় তখন প্রতীত্য সমুৎপাদ চক্র স্বাভাবিক ভাবে অনাদিপরম্পরা পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

কিছু লোক বলেন যে তারা তিন চার বৎসর যাবৎ ধর্মের অনুসন্ধান বা সত্যের সন্ধানে স্বচেষ্টা কিন্তু এখনো কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এরকমও হতে পারে- তারা হয়ত জানে না ধর্ম তাদেরকে ডেকে বলছে “আস-দেখ”। “এহিপস্সিকো” সব সময় ডেকে বলছে আস এবং দেখ। আমরা সমস্ত প্রাণীর নিকট স্কন্ধই একমাত্র ধ্যানের বিষয় বস্তু। ইহাকে তাদের সহিত সংযুক্ত করা যায়- যারা নৌকায় দাঁড় টানে কিন্তু জলের দেখা পায় না। যেখানে স্কন্ধ আছে সেখানে উদয়-বিলয় আছে। যেখানে উদয়-বিলয় আছে সেখানে অবশ্যই দুঃখ আছে। যখন দুঃখকে অবগত হওয়া যাবে তখন অনাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যাবে। এভাবেই সম্যক দৃষ্টিযুক্ত দুঃখ সত্য জ্ঞান উৎপন্ন হবে।

স্বাভাবিক অক্ষমতার হেতু স্কন্ধ সম্পর্কে অজ্ঞানতা উৎপত্তি-বিনাশকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে না পারা যোগী

ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে গণ্য করে যোগী বিভ্রান্ত হয়। কারণ তিনি নির্ভর যোগ্য শিক্ষকের সানিধ্য অথবা তিনি কর্মস্থান শিক্ষকের সন্ধানের প্রচেষ্টা করেন নি যার শিক্ষার প্রধান বিষয় প্রতীত্যসমুৎপাদ, যা সত্য বা সচ্চের সহিত সংযুক্ত। যে শিক্ষা প্রতীত্যসমুৎপাদ চক্রের স্পোক এবং চাকা ভেঙ্গে ছিন্ন বিছিন্ন করতে সক্ষম।

-----o-----

## একবিংশ অধ্যায়

### বেদনাস্কন্ধ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ

এই বইটি কে পড়ছে? পাঠক কি পুরুষ, স্ত্রীলোক অথবা বেদনা? উত্তর কি হবে? বেদনা হল যৌগিক বা পঞ্চ পুঞ্জীভূত সমষ্টি বা পঞ্চস্কন্ধ এর সমষ্টির একটি যাকে বেদনাস্কন্ধ বলে। এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হল বেদনাস্কন্ধ পড়ছে। ভস্তু, তুমি, আমি পড়ছি না।

প্রতীত্যসমুৎপাদে বলে “স্পর্শ-পচ্চয় বেদনা।” অর্থাৎ স্পর্শ এর উপর ভিত্তি করে বা নির্ভর করে বা পরামর্শ করে বেদনার উৎপত্তি। ইহাই হল পূর্বে উল্লেখিত কারণের ফল।

আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে, বেদনা কখন কোথায় উৎপন্ন হয়? স্পর্শ যখন পূর্ববর্তী বা অগ্রবর্তী হয় তখন বেদনার উৎপত্তি হয়। বেদনা চোখকে ভিত্তি করে, কর্ণকে ভিত্তি করে, নাসিকাকে ভিত্তি করে, জিহ্বাকে ভিত্তি করে, কায়কে ভিত্তি করে এবং মনকে ভিত্তি করে বেদনা উৎপন্ন হয়। আমরা কাদের সহিত বসবাস করি? আমরা বেদনার সহিত সহঅবস্থান করি। বেদনা আকাশের মত। আঙ্গুল দিয়ে যে দিকেই নির্দেশিত হোক না কেন- সেখানে আকাশ রয়েছে। এমন কোন ক্ষণ নাই যা বেদনা মুক্ত। নিজে নিজেই ইহাকে জ্ঞানও সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে

হবে। বুদ্ধ নকুলের পিতাকে বলেছিলেন- যদি কেউ বলে যে আমি এক মূর্ত্তের জন্য বেদনা মুক্ত আছি। ইহা আর কিছুই নয়- তার নির্বুদ্ধিতা। বেদনা সর্বব্যাপী, সবখানেই বেদনা উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানাভাবের কারণে কোন কোন যোগী বেদনাকে আহ্বান করে। যখন যেখানে সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তু বা বিষয়ে সংস্পর্শ হয় তখন চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা উৎপন্ন হয়। কর্ণের বা শ্রোত্রের সহিত শব্দের সংস্পর্শ হয় তখন “শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা” অনুরূপ ভাবে নাসিকা, জিহ্বা, কায় বা মন তাদের উৎপত্তি প্রতিফলিত করে। বেদনাগুলি যথাক্রমে ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায় সংস্পর্শজ বেদনা, মনো সংস্পর্শজ বেদনা, ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আকাজ্জিত, অনাকাজ্জিত বা নিরপেক্ষ বিষয় বস্তু অনুসারে সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা বা উপেক্ষা বেদনা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বিদর্শন ভাবনা নির্বাণ উপলব্ধি বিষয়ে যোগীকে পরিচালনা করতে পারে। প্রত্যেকে জানে ব্যাথাই বেদনা। কিন্তু অগ্রহী যোগীদের জানার জন্য ইহা যথেষ্ট নয়। তাদেরকে এর চেয়ে ও বেশি জানতে হবে। যখন তিনি বেদনার উপর চিন্তাপ্রবন বা ধ্যান করেন এবং কেবল বেদনাকে সব সময় দেখতে থাকেন, তবে বলতে হবে তিনি ঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে না, কারণ, তিনি এখনো বেদনা বিদ্যমান দেখে বলতে পারেন বেদনা নিত্য। অর্থাৎ তিনি দেখেন বেদনা চিরস্থায়ী প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নয়। মহান বুদ্ধ বলেছেন “বেদনা অনিত্য।” যার প্রকৃতি হল বেদনা চিরস্থায়ী নয়।

বেদনা অন্যান্য স্কন্ধসমূহের মত পরপর দুই মুহূর্ত্ত একই অবস্থায় অবস্থান করে না। ইহা উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং ধ্যানীকে সচেতন জ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (অনিত্য) বেদনার বিলুপ্তিকে জানতে হবে। বেদনা

আয়ুষ্কাল ২/১ মুহূর্ত অর্থাৎ অতি ক্ষীণ। উৎপত্তির পরবর্তী মুহূর্তেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উপমা স্বরূপ ইহাকে চুলকানির সহিত তুলনা করা যায়। প্রথমে ইহা অসহনীয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার তীব্রতা কমে যায় এবং অবশেষে চুলকানির অনুভূতির সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্যভাবে বলা যায়, প্রারম্ভে প্রকোপের মাত্র ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে, তারপর প্রবলতা মধ্যম পর্যায়ে নেমে আসে। এরপর তীব্রতা অতি সামান্য অনুভূত হয় এবং অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে প্রথমে ব্যাথা, শূল বা রুগ্নতা তীব্রভাবে অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

সন্ততির ইন্দ্রজালের প্রভাবে ইহা অনেক ক্ষণ ধরে অনুভূত হতে থাকে। অতএব যোগীরা সচেতন জ্ঞানে বেদনার উৎপত্তি বিনাশকে জানতে হবে এবং ইহা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাথা বা শূল যা সাধারণ লোকেরা মনে করে থাকে। সে যাই হোক, যোগীদের উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে বেদনার উৎপত্তি বিলুপ্তির প্রতি বেশি জোর দিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কিন্তু সম্যক দৃষ্টি দিয়ে নিবিড় ভাবে অতি নিকট থেকে উৎপত্তি-বিনাশ বা অনিত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে ধর্ম সব সময় প্রকাশ বা জ্ঞাত করে।

যোগীদের ভুললে চলবে না যে যখন বেদনার উপর ধ্যান করা হয় তখন কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ কে দৃষ্টির বাহিরে রাখা উচিত হবে না। নতুবা যোগী সত্যে উপনীত হতে পারবে না।

উপমা স্বরূপ যদি সুখ বেদনা উৎপন্ন হয় তখন যদি যোগী উদয়-বিলয় (অনিত্য) এর প্রতি স্মৃতিমান হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম না হয় নির্গত সেখানে তৃষ্ণা অনুসরণ করবে। যখন তৃষ্ণা উৎপন্ন হবে তাতে উপাদান অনুসারিত হবে যার কারণে কর্মভবের উৎপত্তি পরিনামে জাতি, জরা, মরণ ইত্যাদির উৎপত্তি ঘটবে। এই ভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদের শৃঙ্খল চক্র অনাদি অনন্ত

কাল ধরে ঘুরতেই থাকবে। এই ভাবে প্রতীত্য সমুৎপাদ কেন্দ্রবিন্দু বা মধ্য থেকে ঘূর্ণয়ন আরম্ভ করে।

অন্যভাবে, যোগী যদি সুখ বেদনার উদয়-বিলয় কে নিরক্ষণ ও গভীর ভাবে স্মৃতিমান হন তখন তৃষ্ণা উৎপন্ন হতে পারবে না। যেহেতু তৃষ্ণা নেই তাই উপাদানের উৎপত্তি হবে না। যেহেতু উপাদানের স্থান নাই সেহেতু কর্মভবের উৎপত্তি নাই। কাজেই জাতি জরা মরণ ইত্যাদিও নাই। সুতরাং প্রতীত্যসমুৎপাদ শৃঙ্খল কেন্দ্রবিন্দুতে বা মধ্যখানে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

উপরোক্ত নিয়মে যদি দুঃখ বেদনাকে সম্যক দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা না হয় তবে শোক, পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদি নির্গাত পেছনে পেছনে ধাবিত হবে। এভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ রেল গাড়ির মত শেষ প্রান্ত থেকে যাত্রা আরম্ভ করবে।

অনুরূপভাবে উপেক্ষা বেদনাকে যদি সঠিক ভাবে ধ্যানের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা না হয় তবে অবশ্যই অবিদ্যা উৎপন্ন হবে এবং পরিণাম ফলে প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রারম্ভ থেকে যাত্রা আরম্ভ করবে।

তিন ধরণের বেদনাকে যদি সঠিক ভাবে সম্প্রজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতি বা ধ্যান করতে না পারে তবে প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রারম্ভ বা শুরু, মধ্য থেকে এবং শেষ প্রান্ত থেকে ঘূর্ণিয়মান হবে।

যদি একান্তভাবে স্মৃতিমান হয়ে দ্রুত ও নিশ্চিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবে প্রতীত্যসমুৎপাদ শৃঙ্খল মূল বা আরম্ভ, কেন্দ্র ও শেষ প্রান্ত থেকে খণ্ড খণ্ড হয়ে চূড়ম্বার হয়ে যাবে।

বুদ্ধ বলেছেন যখন তৃষ্ণার দ্বারা সুখ বেদনার অনুসারিত হয় তাতে নির্বাণের অনুভূতি কখনো অর্জন করতে পারবেন না।



অনুরূপ ভাবে যখন দ্বেষ, দৌর্মনস্য দুঃখকে অনুসরণ করে তখনও নির্বাণে উপলব্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

যখন উপেক্ষা বেদনাকে যথাযথ মনোযোগের সহিত স্মৃতি করা না হয় তবে অবিদ্যা (মোহ) উৎপন্ন হবে পরিনামে প্রতীত্যসমুৎপাদ মূল থেকে ঘূর্ণয়ন আরম্ভ হবে। অতএব যোগীকে উৎপত্তি-বিলয়ের উপর নিবিষ্ট হওয়ার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। নিদান বন্ধ সূত্রে বলেছেন- আসব নিরোধো অবিজ্ঞা নিরোধা”। ইহার অর্থ যখন আসবমুক্ত হবে তখন অবিদ্যা বিদ্যায় পরিণত হবে। ইহাতে প্রতীত্যসমুৎপাদ মূল থেকে চূর্ণ হয়ে যাবে। প্রতীত্যসমুৎপাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভঙ্গ করা যাবে যদি যথা সময়ে তিন স্থানে তিন প্রকার বেদনাকে নিবিড় ভাবে ধ্যানুশীলনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যদি এরূপ না করা হয় তবে প্রতীত্যসমুৎপাদ কেন্দ্রের শেষ প্রান্ত ও মূল বা প্রারম্ভ থেকে যাত্রা আরম্ভ করবে।

সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা ধারাবাহিক ভাবে একটার পর উৎপত্তি-বিনাশ হয়ে থাকে। তাদেরকে পর্যবেক্ষণ ও ধ্যানের অবর্তমানের কারণে অবিদ্যা উৎপন্ন হবে যার কারণে সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদির উৎপত্তির হেতু প্রতীত্যসমুৎপাদের কার্যক্রম আরম্ভ হবে।

উপমা স্বরূপ, বিজ্ঞানের উৎপত্তি সংস্কার এর কারণে বিজ্ঞান অর্থ প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান (পুনঃ জন্মের চেতনা) সাধারণত অপায় প্রতিসন্ধি। বুদ্ধ তাঁর নখের অগ্রভাগে মাটি উপস্থাপন করে যুক্তি প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন করছেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাটির তুলনায় নখাগ্রের মাটি সম মানুষ কেবল সুগতি লাভ করতে সক্ষম। অন্যেরা অপায় ভূমিতে পতিত হয়ে থাকে।

## বেদনানুপস্ফুটন

### বেদনাকে ভিত্তি করে বিদর্শন ধ্যান

তিন প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের সহিত যখন সংবেদনশীল স্নায়ু বিষয় বস্তুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘটে তখন বেদনা উৎপন্ন হয়। এই তিনটি দৃঢ়ভাবে বা দৃঢ়গ্রহণ কে স্পর্শ বলে। স্পর্শই মূল কারণ বলা হয়। স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা। কারণ স্পর্শের কারণেই বেদনার উৎপত্তি।

সুতরাং দেখা যায় বেদনাকে অভীষ্ট লক্ষ্য অনুসন্ধান করা হয়নি। যখন যেখানে স্পর্শ অনুভূত হয় সেখানেই বেদনা উৎপন্ন হয়। যেমন চক্ষুকে নির্ভর করে, কর্ণ, নাসিকা, নির্ভর করে বেদনা উৎপন্ন হতে পারে। জিহ্বা নির্ভর উপেক্ষা উৎপন্ন হতে পারে শরীরে সুখ বেদনা এবং দুঃখ বেদনা দুটি উৎপন্ন হতে পারে।

মনে যে বেদনা উৎপন্ন হয় তা সৌমনস্য বা দৌর্মনস্য হতে পারে।

সময় সময় কেউ কেউ যখন সুখময় বা আনন্দঘন পরিবেশে পরিবেষ্টিত থাকে তখন তাঁর সৌমনস্য বেদনা উৎপন্ন হতে পারে। আর যখন প্রতিকূল পরিবেশ, ব্যবসায় ক্ষতি বা পারিবারিক গোল যোগের কারণে দৌর্মনস্য বেদনায় ভুগতে পারে।

কেউ কেউ উপেক্ষা বেদনায় ভুগতে পারে যদি তিনি তার চাকুরী হতে পদত্যাগ করতে হয়। তাকে দৌর্মনস্য বেদনায় ভুগতে হবে।

আগ্রহী যোগীদের জন্য প্রয়াত মহাথের মোগোক্ ছেয়াদ সহজ পদ্ধতিতে বেদনানুপস্ফুটন ভাবনা অনুশীলন করার জন্য নিম্নলিখিত ছক তৈয়ার করে গেছেন।

## বেদনানুদর্শন

১। দেখা মাত্র উপেক্ষা বেদনা

২। শ্রবণ মাত্র উপেক্ষা বেদনা

৩। স্পর্শ মাত্র উপেক্ষা বেদনা

৪। আশ্বাদন মাত্র উপেক্ষা বেদনা

৫। কায়িক দুঃখ বেদনা

৬। কায়িক সুখ বেদনা

সৌমনস্য বেদনা

দৌর্মনস্য বেদনা

উপেক্ষা বেদনা

সুখের অবস্থায় আশ্বাস-প্রশ্বাস হলে সুখ বেদনা

দুঃখের অবস্থায় ঐ প্রশ্বাস হলে দুঃখ বেদনা

না সুখ না দুঃখ অবস্থায় আশ্বাস প্রশ্বাস

হলে উপেক্ষা বেদনা।

যোগীদের উচিত যখন যেখানে যে বেদনা উৎপন্ন হোক না কেন তাকে গুরুত্ব সহকারে গভীর ভাবে স্মৃতি করতে হবে। সাধারণত অনুশীলন পদ্ধতি অনুসারে সুনির্দিষ্ট করে থাকে। কিন্তু বেদনা ঠিক সময়ে শরীরের যে কোন স্থানে উদয় হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় না এধরণের অনুশীলন সঠিক। ইহা ভুল নিশানা লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ মত বলা যায়, যে কেউ বেদনার সঙ্গে সংস্পর্শ করতে সক্ষম নয়। স্পর্শের অগ্রবর্তীতার কারণে বেদনার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

যখন যোগী দেখে এবং বিশ্বাস করে যে এই মুহূর্তে যে বেদনাকে সে ধ্যান স্মৃতি করছে পরবর্তী মুহূর্তে সে একই রূপ বেদনা অনুভূত হচ্ছে। তবে তাতে মনে করতে হবে তাকে

আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন- বেদনানং ভিক্ষবে অনিচ্ছতো পস্‌সতো- ভিক্ষুগণ! বেদনাকে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করলে দেখা যাবে ইহা ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল এবং দুই মুহূর্ত একই অবস্থায় থাকে না। যোগী যদি সম্যক জ্ঞানে অনিত্যতাকে সচেতনতার সহিত উপলব্ধি করতে না পারেন তাহলে তিনি এখনো ধ্যানানুশীলন যথাযথ নিয়ম বহির্ভূত।

সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে প্রতিনিয়ত বেদনা জানিয়ে দেয় যে সে কেবল মাত্র উৎপন্ন হয় না বিনাশও হয়ে যায়। সঠিক অনুশীলন পদ্ধতির অভাবে হয়ত বেদনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

সতিপট্ঠান সূত্রে বলা হয়েছে- সমুদয় ধম্মানুপস্সী বেদনাসু বিহরতি, বয় ধম্মানুপস্সী বেদনাসু বিহরতি, সমুদয়বয় ধম্মানুপস্সী বেদনাসু বিহরতি। অর্থাৎ যোগীকে অবশ্যই বেদনার উৎপত্তিতে স্মৃতি করতে হবে এবং বেদনা বিনাশের সময় ও স্মৃতি করতে হবে এবং উদয়-ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে স্মৃতিমান হতে হবে। যোগীদের স্মরণ রাখা খুবই প্রয়োজন যে বেদনাকে নিবারণ করা উদ্দেশ্যে নয়। সাধারণ মানুষ যখন ব্যাথা, শূল বা অসুস্থতা অনুভব করে তখন তাকে বেদনা বলা হয়, কিন্তু বেদনা তার চেয়েও বেশি। ইহা সব সময় বিদ্যমান থাকে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, শরীর ও মনের যে কোন একটিতে বেদনা উৎপন্ন হয়।

এক মুহূর্তের জন্যও বেদনা মুক্ত থাকা যায় না। সুতরাং স্কন্ধসমূহের যে কোন একটি প্রকটিত বেদনাকে চিহ্নিত করে ধ্যানানুশীলনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

উদয়-বিলয় অনিত্য, এই উপলব্ধি ক্ষমতা সম্যক স্মৃতি মার্গ। সুতরাং এভাবে অনিত্য এবং মার্গ, অনিত্য এবং মার্গ চলতেই

থাকবে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলেছেন যখন অনিত্য ও মার্গের মধ্যে অনাহত কোন ক্লেশ প্রবেশ না করে এ জীবনে মার্গফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

যখন বিলয় বা বেদনা বিলুপ্তি স্মৃতি সহকারে ধারণ করা হয় তাই অনিচ্চানুপস্সনা পক্ষান্তরে যখন যোগী কেবল মাত্র বেদনার প্রতি স্মৃতিমান হয় তাকে নাম পরিচ্ছেদ এণ্ড্‌এন বলে যাহা কিন্তু উচ্চতর প্রজ্ঞা বা এণ্ড্‌এন নয়।

### অরহত এবং পৃথক জনের উপর বেদনার প্রভাব বা ফলাফল

সমস্ত শরীরে কেবল মাত্র চুল, হাত ও পায়ের নখ এবং গুরু চামড়া ছাড়া প্রতিনিয়ত প্রতি ক্ষণে বেদনা অনুভব হয়ে থাকে।

বেদনা, চিত্ত ইহারা সহজাত ধর্ম (একই সঙ্গে উদয়, সহ অবস্থান এবং একই সঙ্গে বিলয়) উভয়ে একই সঙ্গে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ পৃথকজন আর্য জ্ঞানহীন ধর্ম চলার পথে হোঁচট খেয়ে পা মচকায় ফেলে। সে কেবল শারীরিক যন্ত্রনা অনুভব করে না দৌর্মনস্য যন্ত্রনায় ভুগে। শারীরিক যন্ত্রনা ভোগকালীন যন্ত্রণা মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। তাতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি। দৌর্মনস্য বেদনার উৎপত্তি সম্পর্কে সে সচেতন নয়- যন্ত্রণা মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা সম্পর্কেও জ্ঞাত নয়। ইহা কিন্তু অবিদ্যা। প্রথমত সে যন্ত্রনায় ভোগে (দুঃখ বেদনা) দ্বিতীয়ত সে দৌর্মনস্য বেদনা (মানসিক বেদনা) তৃতীয়ত যন্ত্রণা মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা (তৃষ্ণা) চতুর্থত সে দৌর্মনস্য এবং তৃষ্ণার উৎপত্তি সম্পর্কে অসতর্ক। কিন্তু অরহতের ক্ষেত্রে যখন বেদনাগ্রস্থ হয় তখন তিনি শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করে কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে না, কারণ তিনি মার্গ ফলের দ্বারা দৌর্মনস্য এর মূল উৎপাটন করে ধ্বংস করেছেন।

আর্য্য বা অনার্য্য অনুশীলনকারী সুখ দুঃখ বেদনা উৎপত্তি-বিলয় (অনিত্য) ভাবনা করার সময় বেদনা পচয় দৌর্মনস্যও উৎপন্ন হয় না এবং বেদনা পচয় তৃষ্ণা ও উৎপন্ন হয় না,- পরিবর্তে বেদনা পচয় পঞ্ঞা বা প্রজ্ঞা। অর্থাৎ বেদনা দৌর্মনস্য বা তৃষ্ণার কারণ না হয়ে- বেদনা পচয় প্রজ্ঞার কারণ হয়ে প্রতিভাত হয়। কারণ যখনই বেদনার প্রকৃত স্বরূপ বা স্বকীয়তা অনুভূত হয়- অর্থাৎ বেদনা অনিত্য, অস্থির এবং সহ্যশক্তিহীন এবং পরপর দুই মুহূর্ত একই অবস্থায় থাকে না।

বিভ্রান্তি বশতঃ মনে হয় বেদনা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া এবং যজ্ঞণাদায়ক।

যোগী যখন ধ্যানমগ্ন হয় তখন তাঁকে অবশ্যই দুঃখ বেদনাগ্রস্ত হতে হয়। আংশিক ভাবে ইহা বর্ষার ফলার সহিত তুলনা করা যায়। প্রত্যেক আচমকা প্রতিক্রিয়াকে আকস্মিক ভাবেই মোকাবেলা করতে হবে। অর্থাৎ যখন দৌর্মনস্য উৎপন্ন হবে তখন শুধু মাত্র উদয়-বিলয় (অনিত্য) হিসাবে ভাবনা করতে হবে।

সুতরাং যখন ক্ষিপ্ত গতিতে উদয়-বিলয় ভাবনা বা স্মৃতি করা হয় তখন দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না ফলে শোক, পরিদেবন এবং উপায়াস ও উৎপন্ন হয় না। এভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ মধ্যভাগে/কেন্দ্রে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। মূল হেতু অবিদ্যাকে পরিষ্কার ভাবে সম্যক দৃষ্টি দিয়ে জানতে হবে যে যা অন্যান্য হেতু সমূহের সহিত সহ উৎপন্ন, সহ অবস্থান এবং সমন্বয়ে বিলুপ্ত হয়। ইহার মূল হল তৃষ্ণা বা শোক, পরিদেবন, দৌর্মনস্য এবং এই কারণেই তৃষ্ণা, শোক, পরিদেবন ও দৌর্মনস্য উচ্ছেদ হয়ে যায় অবিদ্যা আর অবিদ্যার মত থাকে না- তখন তা বিদ্যায় পরিণত হয় (বিজ্ঞা উদপাদি) যখন অবিদ্যার স্থলে বিদ্যার আবির্ভাব হয় তখন অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে প্রতীত্যসমুৎপাদ

প্রারম্ভেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। (অবিদ্যা নিরোধে সংখারা নিরোধ)

স্মৃতি ভাবনার সময়ে শরীরে যখন চুলকানির অনুভূতি উৎপন্ন হয় তখন কোন কারণেই চুলকানির উৎপত্তি বিলয়কে স্মৃতি করতে ব্যর্থ হলে চলবে না। ব্যর্থতার কারণে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ চুপি সারে ঢুকে যাবে। চক্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। লেখা আছে বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মার্গে প্রবেশ (বিদর্শন পূর্ব ভাগ মার্গ) অবশ্যই বেদনাও তৃষ্ণা উভয়ের মধ্যকারে প্রস্তুত করতে হবে। অন্য ভাবে বলা যায় যোগীকে অবশ্যই যে কোন বেদনা উদয়-বিলয় হওয়ার সাথে সাথে স্মৃতি করতে হবে যাতে বেদনা তৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত হতে না পারে, দ্বিতীয় অংশে কোন কারণেই তৃতীয় অংশের সহিত সংযুক্ত হতে পারবে না। চক্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সংস্কারের সংযুক্তি শৃঙ্খল বা প্রতীত্যসমুৎপাদ ভগ্ন হয়ে গেছে। অথবা প্রতীত্যসমুৎপাদ মধ্যখানে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

বেদনা এবং তৃষ্ণার মধ্যবর্তী সময়ে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত এই বিন্দুতেই লাভ করা যায়। অর্থাৎ তৃষ্ণা মার্গের দ্বারা কর্তিত হয়ে অন্যদিকে নিরোধ হয়ে গেছে। বলা হয়ে থাকে বেদনা নিরোধে, তৃষ্ণা নিরোধে, তৃষ্ণা নিরোধই মার্গ। অর্থ হল এই, যখন বেদনা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আপনা-আপনি তৃষ্ণা বিনাশ প্রাপ্ত হবে। যখন তৃষ্ণা সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে তখন মার্গ লাভ হবে। কারণকে যখন ক্ষয় করা হয় তখন আর বিপাক উৎপন্ন হতে পারে না। বেদনাকে যখন অনিত্য রূপে ভাবনা করা হয় তখন সেখানে তৃষ্ণা বা আসক্তির উৎপত্তি হবে না।

মহাথের প্রয়াত মোগোক্ ছেয়াদ পরোক্ষ ভাবে বর্ণনা করেছেন আমাদের মহামানব বুদ্ধ সোনার পালঙ্কে পরমার্থ

বোধিসত্ত্ব অবস্থায় যখন তৃষ্ণাকে বেদনা হতে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন তখনই বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

কারো কারো দ্বারা বিবেচিত হয় যে এই বিবরণ ব্যতিক্রমধর্মী, অসাধারণ ও বিহ্বল কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে পরমার্থ বুদ্ধ সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন বোধি বৃক্ষের নীচে সর্ব উৎকৃষ্ট সোনার পালঙ্কে বসে।

এখন যোগীদের অবশ্য অবশ্যই অনুধাবন করবেন প্রতীত্যসমুৎপাদে বর্ণিত দ্বিতীয় অংশের সহিত তৃতীয় অংশের সংযোজন বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা কতই গুরুত্বপূর্ণ। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা আর কিছুই নয় কেবল মাত্র বেদনার উদয়-বিলয় অনিত্য এর উপর স্মৃতি ভাবনা করা যাতে তৃষ্ণার উৎপত্তি না হয়।

উপসংহারে আবারো গুরুত্ব সহকারে বলা প্রয়োজন বিদর্শন ভাবনা ছাড়া পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন পন্থা নেই যাহা অপায় ভূমিতে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

### নিয়ন্ত্রণহীন দেহ বিদর্শন ভাবনার উপযোগী কি?

বুদ্ধের সময়ে মহাথের কপ্লিনা বুদ্ধের অবস্থানকালীন জেতবন বিহারে গিয়েছিলেন। বুদ্ধের অনতিদূরে হাটু ভাজ করে শরীর সোজা করে শান্ত ভাবে বসে একাগ্রতা অনুশীলন নিরক্ষণ করছিলেন। বুদ্ধ থেরকে দেখে ভিক্ষুদেরকে ডেকে বললেন- হে ভিক্ষুগণ তোমরা থের এর শরীরের বা মনের কোন নড়াচড়া নজরে আসছে কি? না ভণ্ডে,- ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন ভিক্ষুদের মধ্যখানে ধ্যানাসনে উপবেশন রত থের এর শরীর কোন নড়াচড়া দেখছি না।”

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ আরও বললেন বহুবার একাগ্রতা বা স্মৃতি অনুশীলন করলে দেহ মনের নড়াচড়া ঘটে না। মহা বর্গ সূত্রে



উল্লেখ আছে- বহুবার ধ্যান বা স্মৃতি অনুশীলনের কারণে দেহ স্থির থাকে ।

প্রতিসম্ভিদা মার্গে আনাপান স্মৃতি কথায় বলা হয়েছে সম্পূর্ণ স্মৃতিমান হয়ে আনাপান স্মৃতি (শমথ) ভাবনা করলে দেহ নড়াচড়া করবে না- শুধু তাই নয় এর বিপরীতে শরীর ও মন উভয়েই অনড় থাকে এখন পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা যায় যারা বুদ্ধ নির্দেশিত শিক্ষা মতে আনাপান স্মৃতি অনুশীলন করে তাদের দেহ-মন উভয়ে শান্ত ও স্থির থাকে । ইহাকে সবল ও বিশুদ্ধ শমথ বলে ।

ভূলা উচিত নয় যে চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বুদ্ধ শাসনে তিনটি স্তর রয়েছে- যেমন শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা । এখানে প্রজ্ঞা অর্থ বিদর্শন প্রজ্ঞা (উচ্চতর জ্ঞান) । কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে সমাধি বহু উচ্চতর, মহৎ এবং শীলের চেয়ে বেশী পূণ্যময় । অন্যদিকে প্রজ্ঞা বহু উচ্চতর, মহৎ এবং সমাধি থেকে অনেক বেশি গুণ সম্পন্ন । এই কারণে প্রজ্ঞাই হল উচ্চতর । মহৎতর ও মহৎগুণশালী যারা যোগী সমস্ত রকম ক্লেশ দূর করার ক্ষমতা প্রদান করে অস্তিমে নির্বাণ সাক্ষাত করাবে । ইহা আর্য্যমার্গের স্মৃতি সাধন প্রণালী সম্যকদৃষ্টি “প্রধান” শমথ ভাবনায় সম্যক সমাধিই প্রধান । সুতার শমথ কোন কারণেই সমস্ত প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গন করার দাবী করতে পারে না । পঞ্চস্কন্ধের যে কোন একটি বিষয়ের উপর উদয়-বিলয় ভাবনা করে বিদর্শন প্রজ্ঞা অর্জন করা সম্ভব । সুতরাং সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় বিদর্শন ভাবনার দ্বারা দেহ-মনের স্থিরতা আসবে । দেহভঙ্গি স্থিরতা এবং সঠিক জ্ঞান (স্মৃতি অনুকূল মনস্কার এবং মহাকুশল জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত) ও অর্জিত হবে ।

বার্মার কোন কোন স্থানে কিছু কিছু ঘটনা যেমন দেহের কঠোর ভাব ধারণ, দুর্বলতা, অজ্ঞান ভাব, মতিভ্রম এবং ভেঙ্গে

পড়ার খবর জানা যায়। পরিশুদ্ধ বিদর্শন ধ্যানানুশীলনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে বিদর্শন যোগীদের এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব, কারন অনুশীলন নিজেই মহা কুশল এণ্ডেগান সম্প্রযুক্ত চিত্ত যার পথ প্রদর্শক সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক কল্প।

সম্মা- সঠিক দিট্ঠি- দৃষ্টি পথ/দৃষ্টিগোচর, সুতরাং যে যোগী যার সঠিক দৃষ্টিপথ, সাধক চিন্তাধারা এবং স্মৃতি অনুকূল মনস্কার (সঠিক দেহভঙ্গী) যথাভূত জ্ঞান অর্জন করতে পারে যার অর্থ প্রত্যেকটি বিষয় বস্তুকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে বা পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয় (অনিত্য দুঃখ) সঠিক ভাবে নিরূপন করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং আগ্রহী যোগীদের মঙ্গলের জন্য অবশ্যই গুরুত্বের সহিত বিদর্শন অনুশীলন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে এধরনে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরূপ ঘটনা কোন দিন কোন কারণে ঘটতে পারে না। পালি পিটকে, বা অর্থকথায় এ ধরনের কোন অমনোজ্ঞ এবং বিরূপ মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ নেই। সুতরাং যোগীদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে বিদর্শন ধ্যানানুশীলনের সময় খুব সাবধানতার সহিত ধ্যানাচার্য্য নির্বাচিত বা বাছাই করবেন।

সাধু! সাধু! সাধু!

-----○-----

## টিকা পুঞ্জ

### পঞ্চস্কন্ধ ৪

পাঁচটি স্কন্ধ সমষ্টিকে যথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বলে।

রূপস্কন্ধ ৪ পঞ্চস্কন্ধের একটি হল রূপস্কন্ধ। তাহা চার মহাভূতের সমষ্টি যথা-

১। পৃথিবী ধাতু- কঠিন ও কোমল স্বভাব যুক্ত।

২। আপ ধাতু- বন্ধন ও নিঃসরণ স্বভাব যুক্ত।

৩। বায়ু ধাতু- সংকোচন ও প্রসারণ স্বভাব যুক্ত।

৪। তেজ ধাতু- উত্তপ্ত ও শীতল স্বভাব যুক্ত।

উপরোক্ত চার মহাভূতের সমাহারে নিম্নলিখিত উপাদান ও রূপ গুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে যথা-

১। প্রসাদ রূপ- (ইন্দ্রিয় রূপ) চক্ষু, শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়

২। গোচর রূপ- (বিশ্ময় রূপ) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস,

৩। ভাব রূপ- পুরুষ, স্ত্রী

৪। হৃদয় রূপ- (চিন্তা ও চিন্তা বৃত্তির ক্রিয়া ক্ষেত্র) হৃদয়বস্ত্র বা মনো ধাতু বা মনো বিজ্ঞান ধাতু, হৃদপিণ্ড

৫। জীবন রূপ- (রূপের জীবনি শক্তি) জীবিতিন্দ্রিয় রূপ

৬। আহার রূপ- (রূপ প্রতিপালনে নির্ভরশীল) আহার রূপ

সুতরাং তাহাদের সমষ্টি  $৪+৫+৪+২+১+১+১=১৮$  যাহা কর্মাদি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং চিন্তের দ্বার সংস্পর্শের উপযোগী এই জন্য ইহাদিগকে নিষ্পন্ন রূপ বলে।

৭। পরিচ্ছেদ রূপ- (জড় পদার্থের অভ্যন্তরে বিদ্যমান) আকাশ ধাতু

৮। বিজ্ঞপ্তি রূপ- কায় বিজ্ঞপ্তি ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি

৯। বিকার রূপ- (রূপের বিশেষ অবস্থা) লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা

১০। লক্ষণ রূপ- রূপের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন) উপচয়, সন্ততি, জড়তা, অনিত্যতা

$1+2+3+8 = 10$  অনিস্পন্ন রূপ। ইহারা সংস্পর্শজের উপযোগী নহে কিন্তু আকার বিকারাদি আছে বলে অনিস্পন্ন রূপ বলে।

সর্বমোট  $18+10 = 28$ টি কে কর্মজ রূপ বলে।

চিন্তজ রূপ ৪- চার প্রকার ভূতরূপ, চার প্রকার গোচর রূপ, স্পর্শ, আহার, পরিচ্ছেদ, বিজ্ঞপ্তি, লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা এই পঞ্চদশ প্রকার রূপকে চিন্তজরূপ বলে।

ঋতুজ রূপ- চার ভূত রূপ, চার প্রকার গোচর রূপ, আহার, পরিচ্ছেদ, লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা, এই ত্রয়োদশ প্রকার রূপকে ঋতুজ রূপ বলে।

আহার সমুখান রূপ ৪- (যখন আহার পরিপাক হয়ে স্থিত হয় তখন আহার সমুখান রূপ উৎপন্ন হয়) চার প্রকার ভূতরূপ, চার প্রকার গোচর রূপ, পরিচ্ছেদ, লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা এই দ্বাদশ প্রকার রূপকে আহারজ রূপ বলে।

নাম-রূপের হেতু কি?

আমাদের এই পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট দেহ বা “নাম-রূপ” দুঃখময়। সুতরাং নাম-রূপের আত্যন্তিক নিরোধ বা নিবৃত্তিই বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

“অতীতে হেতবো পঞ্চ ইদানি ফল পঞ্চক  
ইদানি হেতবো পঞ্চ আযতি ফল পঞ্চকন্তি।”

“বিশুদ্ধি মগ্নো”

অতীতের পঞ্চ হেতু (অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম-ভব) বশতঃ বর্তমানের পঞ্চফল। যথা- পঞ্চহেতু- তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার ভবিষ্যতে দুঃখময় ফল উৎপাদন করে। সুতরাং “অবিদ্যা” (নাম-রূপের) অতীতের মূল হেতু এবং “তৃষ্ণা” বর্তমানের মূল হেতু।

নাম-রূপ অহেতুক নহে। বিনা কারণে “নাম-রূপ” উৎপন্ন হয় না। যদি নাম রূপ অহেতুক হত তাহলে সর্বত্র সর্বদা সকলের একই প্রকার প্রকৃতি ও অবয়ব (চেহারা) হত। “নাম-রূপ” সহেতুক; তাদের মূল কারণ সমূহ নিশ্চিত আছে। নাম-রূপ যৌগিক বা সঙ্ঘত ধর্ম। সঙ্ঘত ধর্ম মাত্রেই উৎপত্তি ও বৃদ্ধি নির্দিষ্ট বিধানে, নির্দিষ্ট উপায়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(৫) ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্ উপ্পদা ইদং উপ্পজ্জতি, ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্ নিরোধা ইদং নিরুজ্জতীতি।”

“অভিধম্মথ সংগহো”

অর্থাৎ ইহা হলে উহা হয়, ইহার উৎপত্তি হতে উহার উৎপত্তি, ইহা না হলে উহা হয় না। ইহার নিরোধ হলে উহার নিরোধ হয়। যাবতীয় ‘সঙ্ঘত ধর্ম’ সম্বন্ধে, জড়াজড় সম্বন্ধে “কার্য্য-কারণ নীতি’ অবিদ্যা প্রত্যয় হতে সংস্কারের উৎপত্তি। প্রত্যয় অর্থে কারণ নিদান বা হেতু বুঝায়। উপকার বা সাহায্য করে বলে ইহাকে প্রত্যয় বলা হয়।

যার সাহায্যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন্ন হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের ঐ ঘটনার, ঐ ফলের প্রত্যয়, সংস্কারের উৎপত্তি অবিদ্যা প্রত্যয়, কেন না অবিদ্যার অভাবে সংস্কার উৎপন্ন হতে পারে না। এই প্রত্যয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে।

আমাদের এই ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হওয়ার সময় অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান (আসক্তি) ও কর্ম (কুশলাকুশল চেতনা) এই চতুর্বিধ স্বভাব শরীরে উৎপাদক “হেতু” এবং আহার শরীরের উপকারক “প্রত্যয়” রূপে পরস্পর সাহায্য করেছে। সুতরাং অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম ও আহার এই পাঁচটি- রূপকায় বা দেহের পক্ষে হেতু প্রত্যয়। তন্মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান এই তিনটি সন্তানের মাতার ন্যায় এই দেহের উপনিশ্রয়, “কর্ম” সন্তানের পিতার ন্যায় দেহের পক্ষে হেতু প্রত্যয়। আহার ধাত্রীর ন্যায়। উহারা প্রতি মুহূর্তে রূপ-কায়ের অবস্থান্তর ঘটচ্ছে।

### বেদনা স্বক্ক

১। সুখ বেদনা- (দেহ সম্পর্ক যুক্ত এবং আনন্দ দায়ক অনুভূতি)

২। দুঃখ বেদনা- (দেহ সম্পর্কযুক্ত এবং দুঃখ দায়ক অনুভূতি)

৩। উপেক্ষা বেদনা (বিষয়টি মনোজ্ঞ নয় অমনোজ্ঞ নয়)

৪। সৌমনস্য বেদনা (মনের সহিত সম্পর্কযুক্ত সুখদায়ক অনুভূতি)

৫। দৌর্মনস্য বেদনা (মনের সহিত সম্পর্কযুক্ত দুঃখদায়ক অনুভূতি)

এই পঞ্চবিধ বেদনা অবস্থা ভেদে কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর চিন্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে থাকে। “বেদযতি আরম্মন রস অনুভবতী”তি বেদনা” স্পষ্ট আলম্বনাদির “রস-বোধই” বেদনা। আলম্বনের রসানুভব ইহার কাজ, যদি-

চক্ষু প্রসাদে বর্ণ উৎপন্ন হলে চক্ষু বিজ্ঞান

কর্ণ বা শ্রোত্র প্রসাদে শব্দ উৎপন্ন হলে শ্রোত্র বিজ্ঞান

নাসিকা প্রসাদে গন্ধ উৎপন্ন হলে ঘ্রাণ বিজ্ঞান

জিহ্বা প্রসাদে স্বাদ উৎপন্ন হলে রস বিজ্ঞান  
কায় প্রসাদে স্পর্শ উৎপন্ন হলে কায় বিজ্ঞান  
হৃদ গুহায় ধর্ম উৎপন্ন হলে মনো বিজ্ঞান

কাম জগতে কাম-কুশল চিত্ত দ্বারা শীলের বিশুদ্ধি সাধন হয়।  
রূপ জগতে রূপ কুশল চিত্ত দ্বারা এবং অরূপ জগতে অরূপ  
কুশল চিত্ত দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। এই শীল বিশুদ্ধি  
ও চিত্ত বিশুদ্ধি প্রজ্ঞার মূল। সাধক এইরূপে পঞ্চ-স্কন্ধের সহিত  
পরিচিত হইতে পারলে বিদর্শনের মূল তত্ত্ব জানতে সমর্থ হয়।

ফেণ পিত্তোপমা রূপং বেদনা বুঝুলোপনা।

মরীচিকূপমা সংজ্ঞা, সংখরা কদলূপনা।

মায়ূপমঞ্চ বিঞ্ঞাণং দেসিতদিচ্চ বন্ধনা।

(খন্ড বগ্গ)

“রূপ” ফেণ রাজির মত। “বেদনা” জল বুদবুদের মত  
“সংজ্ঞা” বিভ্রান্তকর মরীচিকার ন্যায়। সংস্কার কদলী বৃক্ষ সদৃশ  
“বিঞ্ঞাণং” যাদুকরের মায়ার ন্যায় প্রবঞ্চিত করে।

কেহ কোন আলম্বন অনুভব করে সে উহা আশ্বাদের সহিত,  
বা বিশ্বাদের সহিত অথবা স্বাধবিহীন মধ্যস্থ ভাবে গ্রহণ করে।  
সুখ দুঃখাদি উক্ত পাঁচ প্রকার বেদনা রাশির সমষ্টিই “বেদনা  
স্কন্ধ”। অন্তরায়তন ও বাহিরায়তনাদির সংযোগ হইলে  
বেদনাদির উদ্ভব হয়।

### সংজ্ঞা স্কন্ধ ৪

কোন আলম্বন বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি  
ইন্দ্রিয় পথে যে ভাবে প্রতিভাত হয় সেভাবে জানাই সংজ্ঞা। যা  
দ্বারা এক আলম্বন হইতে অন্য আলম্বনকে পৃথক করে চিনতে  
পারা যায় এবং আলম্বনে জ্ঞান জন্মে, তাকে সংজ্ঞা বলে। চক্ষু-  
শ্রোত্র-গ্রাণ-জিহ্বা-কায় ও মন সংস্পর্শ হতে সংজ্ঞার উদয় হয়।

সুতরাং উৎপত্তির কারণ ভেদে সংজ্ঞা ছয় প্রকার। অতীত, বর্তমান ও অনাগত যে কোন কালে অভ্যন্তরস্থ বা বাহ্যিক স্থূল, সূক্ষ্মহীণ প্রণীত দূরের বা নিকটের যে কোন বস্তু আলম্বনাদির সহিত ইন্দ্রিয়াদির যখন সংস্পর্শ ঘটে তখন সেই সংস্পর্শ জনিত বস্তুর আকার আকৃতি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানের নাম সংজ্ঞা।

### সংস্কার স্কন্ধ :

পরমার্থ সত্যানুযায়ী চিত্ত-বৃত্তি ৫২ প্রকার। বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অবশিষ্ট ৫০ প্রকার চিত্ত বৃত্তি সমূহকে “সংস্কার” বলে। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন সংস্পর্শ হইতে চিত্ত-বৃত্তি বা চেতনার উদ্ভব হয়। অতীত, অনাগত ও বর্তমান অভ্যন্তরস্থ কিংবা বাহ্যিক স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত, দূরস্থ বা নিকটস্থ কামাবচারাদি চতুর্বিধ ভূমির চেতনা রাশির সমষ্টিগত নাম “সংস্কার স্কন্ধ”। কুশল, অকুশল, আনেঞ্জা, কায়, বাক্য ও চিত্ত-সংস্কার ভেদে, সংস্কার ছয় প্রকার। কর্মকেই সাধারণতঃ সংস্কার বলা হয়। “চেতনাহং ভিক্ষবে কর্মং বদামি।” কর্ম ও সংস্কারের প্রভেদ তাহা হলে কি প্রকারে বুঝিতে হবে? সাধারণত অতীতে যে সকল কর্ম করা হয়েছে এবং অনাগতে যে সকল কর্ম করা হবে সেই সকল কর্মের সমষ্টিকে “সংস্কার” এবং বর্তমান কর্ম প্রবাহকে কর্ম নামে অভিহিত করা হয়।

### বিজ্ঞান স্কন্ধ :

একাংশি প্রকার লৌকিক চিত্ত লইয়া “বিজ্ঞান স্কন্ধ” গঠিত। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-ধাতু ও মনো-বিজ্ঞান ধাতু এবং লৌকিক চিত্ত সমূহের সমষ্টিগত নাম-বিজ্ঞান স্কন্ধ।



ষড়্‌দ্রিয়, দ্বাদশ আয়তন ও অষ্টাদশ ধাতু

ইন্দ্রিয়	আয়তন	ধাতু
চক্ষু	বর্ণ	চক্ষু বিজ্ঞান
শ্রোত্র/কর্ণ	শব্দ	শ্রোত্র বিজ্ঞান
নাসিকা	গন্ধ	স্রাণ বিজ্ঞান
জিহ্বা	রস	রস/জিহ্বা বিজ্ঞান
কায়	স্পর্শ	কায় বিজ্ঞান
মন	ধর্মালম্বন	মনো বিজ্ঞান

তৃষ্ণা ১০৮ প্রকার

তৃষ্ণা- কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা = ৩

আলম্বন = রূপ তৃষ্ণা, শব্দ তৃষ্ণা, গন্ধ তৃষ্ণা, রস তৃষ্ণা, স্পর্শ তৃষ্ণা, ধর্ম তৃষ্ণা = ৬

তৃষ্ণা ৩ x আলম্বন ৬ = ১৮ প্রকার

অতীত কালের তৃষ্ণা = ১৮

বর্তমান কালের তৃষ্ণা = ১৮

ভবিষ্যত কালের তৃষ্ণা = ১৮

= ৫৪ প্রকার

আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক = ৫৪ x ২ = ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা।

## চৈতন্যিক ৫২ প্রকার

স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতিন্দ্রিয়, মনস্কার, বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি, ছন্দ, মোহ, অহী, অনপত্রপা, ঔদ্রত্য, লোভ, দৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান, মিদ্ধ, বিচিকিস্সা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী, অনপত্রপ্প, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা, কায় প্রশন্ধি, চিত্ত প্রশন্ধি, কায়লঘুতা, চিত্তলঘুতা, কায়মৃদুতা, চিত্তমৃদুতা, কায়কর্মণ্যতা, চিত্তকর্মণ্যতা, কায়পাণ্ডুৎতা, চিত্তপাণ্ডুৎতা, কায়ঋজুতা, চিত্তঋজুতা, সম্যক বাক্য সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, করুণা, মুদিতা, প্রজ্ঞান্দ্রিয় ।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব সমাপ্ত

চিরং তিষ্ঠতু বুদ্ধ সাসনম্

-----○-----



অত্র গ্রন্থের অনুবাদক বৌদ্ধ সমাজ গগনে গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র উপাসক দিলীপ বড়ুয়া দীপু ১৯৪১ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি রোড সংলগ্ন রাউজান থানার অন্তর্গত শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অগ্রগণ্য, বহু জ্ঞানী গুণীর জন্মস্থান ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম গহিরা বৌদ্ধ পল্লিতে এই পুণ্যময় প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু গুডামন সওদাগরের পৌত্র প্রয়াত ডাঃ অনন্ত বড়ুয়া এবং তাঁহার সহধর্মীনি জ্যোত্স্নাময়ী বড়ুয়ার প্রথম পুত্র।

অনুবাদক জীবন বীমা কর্পোরেশন হতে ডেপুটি ম্যানেজার ফাইনান্স এণ্ড একাউন্টস হিসাবে ২০০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমান সমাজ সেবায় নিয়োজিত আছেন। তিনি একজন সফল সরকারী কর্মকর্তা, শিল্পী, লেখক, অনুবাদক ও ব্যবসায়ী। তিনি বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী।

ইতিপূর্বে তিনি সম্যক স্মৃতি চর্চা, দান, বিদর্শন বজ্রতা মালা, উদ্ভিগ্ন কেন?, প্রস্তুটিত মহামানব, সংকলিত ও অনুবাদিত গ্রন্থগুলো জনসমাজে উপহার দিয়ে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। বর্তমানে “প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব” গ্রন্থের অনুবাদও তাঁর অনন্য কীর্তি ও দূরদর্শীতার পরিচয় বহন করে। তার আরও অনূদিত ও সংকলিত “বেদনানুদর্শন ও চিন্তানুদর্শন” এবং “স্মৃতি চর্চা” (ভাবনা অনুশীলন জাতব্য) পুস্তকগুলো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। অনাগতেও তাঁর এরূপ প্রয়াস অব্যাহত থাকুক এই কামনায় আমরা পুণ্যদান করছি।

ভদন্ত মুদিতারত্ন ভিক্ষু

মহাসচিব

প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী